আল্‌ফা-বিটা রকেট সিরিজের ৪নং বই···

মানুষ-জন্তুর দ্বীপে

প্রদীপ মিত্র

কলকাতা
আল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস
১৯৬৪

Printed and Published by Alpha-Beta
Publications, Post Box 2539, Calcutta 1

উৎসর্গ

মামণি,

তোমার শুভ জন্মদিনে আমার

প্রথম বই তোমাকে

দিলুম,

—দিলু

কোলকাতা,

২৭শে জ্যৈষ্ঠ,

১৩৭১

"I have wrought my simple plan
If I give one hour of joy
To the boy who's half a man,
Or the man who's half a boy."

—Sir Arthur Conan Doyle

একটি লোমহর্ষক উপন্যাস!

মানুষ-জন্তুর দ্বীপে

প্রদীপ মিত্র



সে এক ভয়ংকর দ্বীপ···শিউরে উঠলাম লোকটার পশুর মত ছুঁচোলো কান দেখে···জানোয়ারের মত হেঁট হয়ে জল খায় তারা ···কারও চেহারা দেখলে মনে পড়ে শুয়োরের চেহারা···কারও মাথায় চিতা বাঘের বীভৎস মুখ বসানো···কেউ খরগোশের তিন-চারগুণ লাফে ছুটে পালায়···প্রকাণ্ড কালো ছায়াটা আমার গলার কাছে ওর মুখ নামিয়ে আনতে লাগল···চোখ দুটো তার আগুনের ভাঁটা···হাঁ করা মুখে লক্‌লকে জিভ আর ঝক্‌ঝকে দাঁত···আমি জ্ঞান হারালাম!···হৃদযন্ত্র দুর্বল থাকলে রক্ত জমানো এই কাহিনী না পড়াই ভালো!

নিজের কথা আগে বলা নাকি শোভনীয় নয়। শুনেছি রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হবে। অনেকে হয়ত নাক সিঁটকোবেন অথবা তাঁদের দুই ভুরু একত্র হবার চেষ্টা করবে যদিও ব্যর্থ হবে স্বাভাবিক কারণেই। তা সত্ত্বেও আমার কথাই আগে বলব। বলব এইজন্যে যে, আমাকে বাদ দিয়ে এই কাহিনী আরম্ভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আশা করি আকুঞ্চিত ভ্রূ এবং নাসিকা সিধে হতে খুব একটা সময় লাগবে না।

ভারতীয় নৌবাহিনীর আমি একজন কমাণ্ডার। আর দেশের এখন জরুরী অবস্থা। কাজেই প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়াতে বা কমাতে আমি একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় নই। ভারত মহাসাগরের কোন একটি বিশেষ এলাকার টহলদারীতে ব্যস্ত আমাদের রণপোত।

জাহাজ ব্যস্ত হলেও জাহাজের পরিচালকবৃন্দকে 'ব্যস্ত' কথাটার মানে জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে এক কপি 'চলন্তিকা' ধরিয়ে না দিলে প্রশ্নকারীকেই বিব্রত হতে হবে।

এ হেন জাহাজের আমি একজন কমাণ্ডার। সারাদিনের এক ঘেঁয়েমির গুঁতোয় বৈচিত্র্য কাকে বলে ভুলতে বসেছি।

এমনি সময় একদিন বিকেলবেলা সারা জাহাজে একটা চাঞ্চল্যের শিহরণ বয়ে গেল। কি? না কিছুদূরে একটা লাইফবোট দেখা গেছে।

কমাণ্ড করার আগেই 'অল হ্যাণ্ডস্ অন ডেক' হয়ে গেল। জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল 'জীবন তরীর' দিকে।

বোটের কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন মুসলমান নাবিক বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে আল্লাকে স্মরণ করল শুনলাম। কারণ বোটের মধ্যে একজন মানুষের দেহ।

নৌকোর গায়ে লেখা ছিল এস্. এস্. ভাগীরথী।

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে থাকলেও জাহাজ ডুবির কথা চেপে রাখা যায় না। আর সেই জন্যেই আপনারাও বছর খানেক আগে এস্. এস্. ভাগীরথীর বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা জানেন। আমারও মনে ছিল।

কিন্তু এক বছর পরে সেই জাহাজেরই লাইফবোটকে সমুদ্রে ভাসতে

দেখে আমি অবাক হলাম।

আরও অবাক হলাম যখন জাহাজের ডাক্তার ঘোষণা করলেন বোটের ওই দেহটি জীবিত মানুষের। লোকটি শুধু অচৈতন্য হয়ে আছে।

নৌকোর মধ্যে থেকে একজন কয়েকটা জিনিসপত্র নিয়ে এল। তার মধ্যে দেখলাম একটা ব্রীফ কেসও রয়েছে।

তখনকার মত সেগুলো ভাল করে দেখে নিলাম।

পরের দিন দুপুরে অবসরমত সময়ে ব্রীফ কেসটা খুলে ফেললাম। খুলতেই দেখি ভেতরে রয়েছে একটা ডায়েরী আর গোটা দুয়েক পেন্সিল।

নিছক কৌতূহলবশতই ডায়েরীটা পড়তে আরম্ভ করলাম।

আরে! এ ত বাংলা ভাষায় লেখা। মালিকের নাম সমীরণ রায়। যাক্, ভদ্রলোক তাহলে বাঙালী।

অন্যের ডায়েরী পড়া নাকি সুরুচির পরিচায়ক নয়। যদি কারুর লেখকের রুচিবোধ সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে তাঁকে এইখানেই নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করব, কারণ পরের পাতাগুলো ওই ডায়েরীর লেখা থেকেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৬ই জুন, ১৯৬২

ঘণ্টা খানেক আগে এস্. এস্. ভাগীরথী ডুবে গেল। এই বঙ্গোপসাগরে যে কাদের সাবমেরিণ টর্পেডো চালাল কে জানে! এটা যুদ্ধ জাহাজ হলেও বা একটা কথা ছিল। একটা সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজের ওপর এই আক্রমণের অর্থ কি বোঝা গেল না।

আশ্চর্য! এতবড় জাহাজের বেতার যন্ত্রটাও ঠিক সময় মত বিকল! নিশ্চয়ই কেউ স্যাবোটেজ করেছে।

ভাগ্যিস্ আমি এই লাইফবোটটা পেয়ে গিয়েছিলাম। অনেকে ত তাও জোটাতে পারল না।

কিন্তু লোকে আমায় পাগল বলবে। অবশ্য যদি কোনদিন মানুষের দেখা পাই। সমুদ্রের এই অসংখ্য ঢেউয়ের মাঝে আমি ডায়েরী লিখছি।

মানুষ যে কি পরিমাণে তার নিজস্ব জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে পারে তা আজ দেখলাম। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে শুনেও হাতের কাছে যা পেলাম নিয়ে

চলে এলাম।

যাই হোক, একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আর চুপচাপ বসে থাকতে হবে না। লিখে রেখে যাব অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। যদিও জানি আমার লেখা কোন মানুষেরই হাতে পড়বে না, বঙ্গোপসাগরের জলই এক সময় আত্মসাৎ করে নেবে একে।

১৮ই জুন, ১৯৬২

আজ দুদিন হল সমানে ভেসে রয়েছি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। খিদের কথা ছেড়েই দিলাম। চারদিকের অথই জলের মাঝখানে বসে আমি কিনা এককোঁটা খাবার জলের জন্যে প্রাণ হারাতে বসেছি।

ঢেউ দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। আর পারছি না। কানের মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, বোধ হয় মৃত্যুর পদধ্বনি। এখন একমাত্র শান্তি—মৃত্যু।

কিন্তু দূরে সবুজ মত ওটা কি? না না, আমি ভুল দেখছি। এ কখনই হতে পারে না। অসম্ভব।

ও দিকের দিগন্তে একটা সবুজরেখা। তবে কি আমি মাটির দেখা পেলাম?

২০শে জুন, ১৯৬২

কাল সন্ধ্যে নাগাদ আমার বোট ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে এসে লেগেছে। চেতনা হারিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বালির ওপর পড়ে ছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পর কিছুদূরে নৌকোটাকে দেখতে পেলাম। কাছে যেতেই দেখতে পেলাম ব্রীফ কেসটা ওর মধ্যে রয়েছে। ডায়েরীটা কিছুতেই আমার কাছ-ছাড়া হবে না বুঝলাম।

ধীরে ধীরে দ্বীপের অভ্যন্তরে যেতে লাগলাম। কিছুদূরে একটা ঝরণা চোখে পড়ল। আকণ্ঠ পান করলাম সেই শীতল জল। জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জলই প্রাণ।

নতুন জন্ম পেলাম যেন। আর তারপরেই একটা বিশাল অজগর সাপের মত ক্লান্তি এসে আমার দেহটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অবশ করে ফেলল।

ঝরণার পাশেই একটা বড় পাথরের ওপর পুরু করে শ্যাওলা জমে যেন আমার জন্যেই বিছানা পেতে রেখেছিল। শুয়ে পড়লাম।

এক ঘুমে রাত কাবার। ঘুম ভাঙতেই দেখি বেলা হয়ে গেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উঠতে হল। ভীষণ খিধে পেয়েছে। খানিকটা যাবার পর একটা আমগাছ চোখে পড়ল। অন্য সময় হয়ত এই আম মুখেই দিতাম না, কিন্তু এখন একেই মনে হল অমৃত।

খাওয়া হয়ে যাবার পর হাঁটতে লাগলাম সেই ঝরণার দিকে। ঝরণাটার কাছে আসতেই কানে এল কোন জন্তুর জল খাওয়ার শব্দ। আর তখনই ভয়ে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কাঁটা দিয়ে উঠল কারণ আমি সারারাত ঝরণার ধারে শুয়েছিলাম। দ্বীপে যদি হিংস্র জন্তু থাকে তাহলে জল খেতে তাদের এখানে নিত্য আসা-যাওয়া। উঃ, কী বোকামীই না করেছি!

একটা গাছের ওপর উঠে পড়লাম যাতে কারণটা দেখতে পাই। ঢিলে-ঢালা জামাকাপড় পরা দুজন মানুষ চোখে পড়ল। যাক, তাহলে এখানেও মানুষের বাস আছে। কিন্তু ওকি! জন্তুর মত জলে মুখ ঠেকিয়ে জল খাচ্ছে কেন ওরা? আশ্চর্য! তাহলে এদের জল খাওয়ার শব্দই আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

কৌতূহল হল। নেমে ওদের কাছে গেলাম। আমায় দেখে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত আকৃতি ওদের। শরীরের উর্ধ্বাংশের তুলনায় নিম্নভাগ অস্বাভাবিক রকমের খর্ব। ধনুকের মত বাঁকা পা। গায়ে অসম্ভব লোম। কুৎসিত মুখ আর চোখে একটা পাশব চাউনী।

হঠাৎ একজন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল: জলে মুখ ঠেকিয়ে জল খেতে নেই।

অন্যজন প্রশ্ন করল: ইনিও কি চাবুকধারী?

আমি বিস্ময়ে নির্বাক। আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ওরা প্রায় টলতে টলতে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গীটা বড় অদ্ভুত।

বিদকুটে ওই লোকগুলোর চেহারা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। ওদের অস্বাভাবিকতা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। কথাগুলোও বড় অদ্ভুত।

চিন্তা করতে করতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এমন সময় কিসের একটা আওয়াজে আমি চমকে উঠলাম। আরও চমকালাম সামনের দিকে

চোখ পড়তেই

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে সাহেবী পোষাক পরা দুজন মানুষ। তাদের পরিচ্ছদেই তাদের সভ্যতার পরিচয় দিচ্ছে।

পরিষ্কার ইংরিজিতে একজন প্রশ্ন করল। কি করে এখানে এলাম, কোথায় দেশ, কি নাম, এই সব জানতে চাইল।

আমি উত্তর দেওয়ার পর দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল : ওঃ আপনি বাঙালী? আমরাও বাঙালী।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসী যে, সে বলল : ইনি ডঃ মাধবেন্দ্র সান্যাল। আর আমার নাম সুরঞ্জন সেন। এখন চলুন যাওয়া যাক। মনে হচ্ছে আপনার কিছু বিশ্রাম আর খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

এদের সঙ্গে যেতে যেতে শুনলাম বঙ্গোপসাগরের কোন একটা ছোট্ট দ্বীপে এসে পৌচেছি আমি। আন্দামান থেকে শ'খানেক মাইল দূরে দ্বীপটা।

দ্বীপটা লম্বায় প্রায় চার মাইল আর প্রস্থে মাইল তিনেক। ওঁরা এখানে আছেন নিরিবিলিতে জীববিদ্যার গবেষণা করার জন্যে। আমি জানালাম জু'লজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রী আমারও আছে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়ে গেল খানিক আগে দেখা সেই অদ্ভুত মানুষ দুটির কথা।

: আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে দুজন অস্বাভাবিক লোককে দেখলাম জন্তুর মত জল খাচ্ছিল, তারা কে বলতে পারেন?

: এই যে আমরা এসে গেছি—কথাটাকে যেন চাপা দেবার জন্যেই মাধবেন্দ্র সান্যাল বললেন—জাহাজডুবির ফলে আপনার অত্যন্ত বিচিত্র একটা অভিজ্ঞতা হল বলুন?

: তা হল। আমি বললাম।

একটা বড় কটেজের সামনে এসে পৌছলাম আমরা।

: আপনার ত তাহলে প্রাণীবিদ্যার ওপর। বেশ জ্ঞান আছে—সুরঞ্জন বলল খাবার সময়।

: বেশ আর কই। অল্প-সল্প জানি।

: আজকেই পুমাটার ওপর পরীক্ষা চালাতে হবে, মাধবেন্দ্র সান্যাল

বললেন আমার দিকে তাকিয়ে—দেখুন আমরা এখানে কিছু গোপন পরীক্ষা চালাই প্রাণীদের ওপর। আপনাকে অনুরোধ করছি আমরা যখন কাজ করব আপনি আমাদের কাছে আসবেন না। সুরঞ্জন আপনাকে আপনার থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

খাওয়া দাওয়ার পর সুরঞ্জন একটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল আমায়। ঘরটা খুবই ছোট। আসবাবের মধ্যে রয়েছে একটা তক্তাপোষ আর একজোড়া টেবিল চেয়ার।

ও চলে যেতেই আমি শুয়ে পড়লাম। মাধবেন্দ্র সান্যাল। নামটা খুবই শোনা শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যে শুনেছি।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমটা ভেঙে গেল একটা তীক্ষ্ণ জান্তব আর্তনাদে। অসহ্য যন্ত্রণায় কোন জানোয়ার চীৎকার করছে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে সমানে চলল সেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা আওয়াজ। তারপরেই তা কমে গেল একটা একটানা গোঙানীতে।

কি করছে ওরা? এ-ত পুমাটার চীৎকার!

: আপনার চা—পেছন থেকে কে যেন কথা বলল আমাকে আর ভাববার সময় না দিয়ে।

মুখ ফিরিয়ে দেখি ঝরণার ধারে দেখা সেই দুজন লোকের মধ্যে একজন আমার চা নিয়ে এসেছে। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। অসম্ভব কুৎসিত আকৃতি।

তারপরেই বিস্ময়ে আর আতংকে আমি শিউরে উঠলাম। লোকটার ঘন চুলের মধ্যে থেকে, চুল না বলে লোম বলাই ভাল, অত্যন্ত ছুঁচলো একজোড়া কান দেখা যাচ্ছে। এত ছুঁচলো যে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন।

লোকটার পশুর মত কান এবং দৃষ্টি দেখে ওকে মনে হল একটা জামা-কাপড় পরা জানোয়ার। আমার দৃষ্টির সামনে ও বোধ হয় বিব্রত হয়ে উঠল। টেবিলের ওপর চা-টা রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে আমি মুক্তি পেলাম।

এখানকার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমার নাকে একটা রহস্যের গন্ধ আসছে। এই নির্জন দ্বীপ, দুজন সভ্য মানুষ, অদ্ভুত দেখতে লোক, সবই যেন কেমন

রহস্যজনক।

মাধবেন্দ্র সান্যাল। নামটা যে কোথায় শুনেছি। মাধবেন্দ্র, মাধবেন্দ্রনাথ সান্যাল। ওঃ হো মনে পড়েছে। খবরের কাগজেই দেখেছিলাম। প্রায় দশ বছর আগে।

মাধবেন্দ্রনাথ সান্যাল, বিখ্যাত প্রাণীবিদ। বিজ্ঞানী মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত তখন। তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ নানা রকম কথা শোনা যেতে লাগল। তিনি নাকি কতকগুলো অবৈধ পরীক্ষায় লিপ্ত।

মনে পড়ে, গুজব এতদূর ছড়াল যে একজন সাংবাদিক ডঃ সান্যালের কাছে ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ নিয়ে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বার করল।

একটা নামকরা ইংরিজি দৈনিক ডঃ সান্যালের পরীক্ষাগুলোকে 'ব্রুটাল' বলেছিল। একই কাগজ তাঁকে 'স্যাডিষ্ট' বিশেষণটিও দেয়।

দেশের কাগজে কাগজে সেই প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলেই বোধ হয় একদিন শুনলাম তিনি নিরুদ্দেশ। এরপর ওই নাম এতদিন বাদে আজ প্রথম শুনলাম।

ইনি কি সেই মাধবেন্দ্র সান্যাল?

২১শে জুন॥

তখন দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল হয়েছে, এমন সময় আমার ঘরে সুরঞ্জন এসে হাজির। ওকে দেখেই কালকের সেই অদ্ভুত লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম: কালকের ওই লোকটার কানগুলো ও রকম ছুঁচলো কেন বলুন ত?

: ছুঁচলো কান!

: হ্যাঁ তাই ত দেখলাম।

: আমার ধারণা ছিল ওর কানগুলো সব সময়ে চুল দিয়ে ঢাকা থাকে — সুরঞ্জন বলতে লাগল — আমি অবশ্য বরাবরই ভেবেছি বোধ হয় কোন একটা অসুখ আছে ওর কিংবা হয়ত জন্ম থেকে ওগুলো অস্বাভাবিক। বিকৃতাঙ্গ মানুষও কতই দেখা যায়।

: আমি কিন্তু কখনও ওরকম কান দেখিনি। ওকে কোথা থেকে এনেছেন?

: আন্দামান থেকে।

এরপরে যেন প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার জন্যেই সুরঞ্জন বলল: আপনার

জাহাজেও বললেন টর্পেডো লেগেছিল একটা। আশ্চর্য! কারা এ রকম করল বলুন ত?

: উত্তর সীমান্তে চীনেদের সঙ্গে যে রকম গোলমাল চলছে তাতে ওরাও যে কোন সময়ে আমাদের দেশ আক্রমণ করে বসতে পারে। ওরাই যদি আমাদের জাহাজডুবির কারণ হয় তবে আমি অন্তত বিস্মিত হব না। তাছাড়া শুনেছি ওদের সাবমেরিণের এক অত্যন্ত বড় এবং সুসজ্জিত বহর আছে।

: তাই হবে—

সুরঞ্জনের কথা শেষ হবার আগেই পুমাটার প্রচণ্ড চীৎকারে আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম।

: আসছি, দাঁড়ান—বেরিয়ে যেতে যেতে সুরঞ্জন বলল।

এদিকে পুমার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ এত তীব্র হয়ে উঠল যে, সহ্য করতে না পেরে আমি দুহাতে কান চেপে ধরলাম।

তাতেও গা শিরশির করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্যহীন হয়ে হাঁটতে লাগলাম যতক্ষণ না ওই বিকট আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল।

এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। জুন মাসের পড়ন্ত রোদ একেবারে চামড়া কেটে বসে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট খাল মত চলে গেছে।

চুপ করে বসে রইলাম আমি কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেবলই আসা-যাওয়া করতে লাগল সেই অস্বাভাবিক লোকটা।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঝিমোতে আরম্ভ করেছি নিজেই বুঝতে পারি নি। আর কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছে তাও জানি না। এমন সময় একটা খস খস শব্দে এই ঝিমুনিটা ভেঙে গেল।

চারদিকে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু আবার সেই শব্দ। এক মুহূর্তে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ যেন আসছে। তারপরেই সামনের দিকে যে দৃশ্য দেখলাম তা আমাকে ক্ষণকালের জন্যে উদভ্রান্ত করে তুললো। একটা চতুষ্পদ মূর্তি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখুনি বুঝলাম ওটা জন্তু নয়, একজন মানুষ। বাঁদর যেভাবে সমতল জমির ওপর দিয়ে চলে, এর যাওয়ার ভঙ্গীটাও অনেকটা সেই ধরনের।

জলের ধারে পৌঁছেই হেঁট হয়ে মুখটা জলের কাছে নামিয়ে আনল। তার-পরেই জল খাবার শব্দ শুনতে পেলাম। মানুষের এ রকম জান্তব প্রকৃতির কথা আমি কোনদিন দুরন্ততম দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

লোকটার গায়ে নীল রঙের পোষাক। ওকে আগে দেখিনি। তবে সারা শরীরে ওরও একই ধরনের কুশ্রীতা ছড়ানো।

জল খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমাকে দেখতে পেয়েই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু যেন সচকিত ভাব। তারপরেই বলে উঠল : চার পায়েতে হাঁটা নিষেধ।

টলতে টলতে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। আশ্চর্য! যে কাজটা এরা করে, অন্য কেউ দেখে ফেললেই তাকে বলে এ কাজটা করা উচিৎ নয়। কালকে ঝরণার কাছে ও লোক দুটোও এই রকমই বলেছিল।

তাদের একটা কথা আমি বুঝিনি। মনে আছে একজন বলেছিল : ইনিও কি চাবুকধারী ?

কে জানে কি এর মানে।

হঠাৎ খেয়াল হল অনেকক্ষণ এসেছি। এবার ফেরা উচিত। ফেরার পথ ধরলাম। হেঁটে চলেছিলাম একমনে। একগাদা প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। যত দেখছিলাম দ্বীপটাকে, ততই অবাক হচ্ছিলাম আমি। একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে এই দ্বীপ এবং তার অধিবাসীদের সঙ্গে।

একজন মানুষ যে কি করে চতুষ্পদের মত হাঁটে এবং জন্তুর মত জল খায়, বোঝা শক্ত। এইভাবে হাঁটা অথবা জল খাওয়াই যেন এদের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক।

নিজের মনেই এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু এবার থামতে হল। সামনেই বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা লাল দাগ চোখে পড়ল। তার থেকে কিছু দূরেই পেলাম একটা খরগোশের মৃতদেহ।

কি সর্বনাশ। দেহ থেকে মাথাটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আমার অজান্তেই আমি শিউরে উঠলাম। হয়ত সবটার মধ্যে একটা নৃশংসতা ছিল বলেই।

আর কিছু চোখে পড়ল না। খরগোশটাকে যেন হঠাৎ মেরে ফেলা হয়েছে, উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা না করেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা জান্তব মুখ। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে মনে হল খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা নেমে গেল। আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি নিরস্ত্র।

কাজেই তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। প্রতিটি ঝোপের ছায়া যেন শুধু ছায়া নয় তার মধ্যে থেকে কারা যেন সব লক্ষ্য করছে। আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম।

বোধ হয় মিনিট পাঁচেক এইভাবে সমানে দৌড়েছি। এমন সময় আমার মনে হল কাছেই যেন কারা কথা বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঁদিকে তাকাতেই তিনটে আবছা মূর্তি চোখে পড়ল।

একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনজনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। আবছা আলো আঁধারিতে তাদের স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ওদের অস্বাভাবিক দীর্ঘ হাত এবং ধনুকের মত পা দেখতে কোনও কষ্ট হল না।

ঠিক কি যে বলছে বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হল খুব উত্তেজিত। তিনজনে একই সঙ্গে কথা বলে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে তাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখে হাসি, কান্নার কোন্‌টা বেছে নেব মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

আর তখনই আমার মনের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে একটা উপলব্ধির ঝিলিক খেলে গেল। ভাবলাম, আগে কেন বুঝিনি।

আকৃতি ও পোষাক মানুষের হলেও এদের সঙ্গে মিল রয়েছে কোন একটা জানোয়ারের। দুজনকে দেখে ত সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায়।

আশ্চর্য। সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি হাঁ করে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম। ওরা ততক্ষণে লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে। অন্ধকারে ওদের চোখগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল।

এরা কি? মানুষ? না পশু?

বোধ হয় মিনিট পনের ধরে চলল এই উদ্দেশ্যহীন নৃত্য। তারপর হঠাৎ তা থেমে গেল। দুজনে অন্যদিকে চলে গেল। আরেকজন দেখি আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুঝলাম আমায় দেখতে পেয়েছে। একবার ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে যাই, কিন্তু তারপরেই বুঝলাম এই অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছোটা অসম্ভব।

উপায় নেই। বিপদের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতেই হবে। কাজেই ওর

দিকে এগোতে লাগলাম আমি। আমাকে আসতে দেখে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম যাতে ও বুঝতে না পারে যে আমি ভয় পেয়েছি।

প্রায় হাত কুড়ির যখন তফাৎ চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম : কে তুমি? জোর করে ধমকের সুরে বার করলাম গলা থেকে।

: না, না—অস্ফুট উত্তর শুনলাম। তারপরেই প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। চারিদিকে বেশ ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। এক এক জায়গায় অন্ধকারটা জমাট বেঁধে থাকায় মনে হচ্ছে এই বুঝি কিছু বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

ওপর দিকে তাকালাম। কালচে নীল আকাশের গায়ে বড় বড় গাছের সিলুটের মধ্যে যেন রাজ্যের বিভীষিকা জড় হয়ে আছে।

একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। হঠাৎ ডানদিক থেকে একটা খস্ খস্ আওয়াজ কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অশরীরী ভয় আমাকে ছোটাতে আরম্ভ করল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম কারণ আমার মনে হল কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। কেউ যেন ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে আমার সমান্তরালভাবে ছুটে চলেছে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু বাতাসের দোলায় পাতার শিরশির আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে এল না।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করলাম। আবার সেই শব্দ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে গতি বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুটা যাবার পরই ছোট খালটার ওপর একটা সাঁকোর কাছে এসে পড়লাম। সেটা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে মুখ ফিরিয়েছিলাম, কিন্তু একটা কালো মূর্তিকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও দেখতে অসুবিধা হল না।

সে-ই আমার পিছু নিক, হয় আমাকে আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে, না হলে অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ খুঁজছে। এমনি সময় সমুদ্রের গর্জন কানে এল। বুঝলাম 'বীচ' এর কাছে এসে গেছি।

ঝপ্। ঠিক পেছনেই একটা শব্দ হল। ফিরে তাকালাম। দেখতে পেলাম একটা কালো ছায়া আর একটা ছায়ার ওপর পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করলাম। গাছপালার ঘনত্ব এবার কমে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার। নিদ্রাহীন চোখে প্রত্যেকটি নক্ষত্র চেয়ে রয়েছে আমার

দিকে। হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে হল বুকটা বুঝি এবার ফেটে যাবে।

পশ্চিম দিকে তাকালাম। সামনেই চোখে পড়ল সমুদ্রের অশান্ত কালো রূপ। তারার আলোয় অস্ফুট ভাবে দেখা যাচ্ছে ধূসর বেলাভূমি।

পেছন ফিরে অনুসরণকারী ছায়াটার দিকে চেয়ে দেখলাম। কোন পশুর চেহারা সেটা নয়। দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আবার ধমকে কথা বলতে গেলাম কিন্তু কে যেন হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও কথা বেরল না মুখ দিয়ে। আবার চেষ্টা করলাম। এবার বোধ হয় চিঁ চিঁ করে একটা আওয়াজ হল।

কোন উত্তর এল না। এক পা এগিয়ে গেলাম। ও শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আর তখনই একটা পাথরে আমি হোঁচট খেলাম।

টাল সামলাতে সামলাতে বিদ্যুৎগতিতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কোন রকমে সামলে নিয়েই পাথরটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর সেটা ছুঁড়ে মাবার ভঙ্গী করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল ও।

উত্তেজনায় তখন আমাব সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছে। পাথরটা হাতে নিয়েই জলের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বুঝতে পারলাম কে যেন প্রচণ্ডবেগে ধেয়ে আসছে আমার দিকে।

আমিও আবার ছুটতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু বালিতে পা আটকে যেতে লাগল। অস্পষ্ট কয়েকটা মূর্তি সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখেই সব লাফাতে লাফাতে চলে গেল। খরগোসের তিনচার গুণ হবে এক একটা।

আমি জল লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। পেছনে যমদূতের মতই তেড়ে আসছে সেই বিকট জীবটা। ওর পায়ের আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি আমাদের ব্যবধান ধীরে ধীরে অল্প হয়ে আসছে। আর তাছাড়া বালির ওপর দিয়ে এইভাবে দৌড়নো যায় না। অসম্ভব। কিন্তু উপায় নেই।

বুঝলাম জলের কাছে পৌছনোর আগেই আমি ধরা পড়ে যাব।

মরীয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে পাথরটা ছুঁড়ে মারলাম। ওর বাঁ কপালে লাগল সেটা। রেগে গিয়ে একটা খ্যাপা ষাঁড়ের মতই এগিয়ে এল ও।

তারপরেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়লাম। ওর শরীরেও অল্প শক্তিই বাকি ছিল। খানিকটা দূরে সেও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তারপরেই সব স্থির।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। একবার মনে হল ওর দেহটা প্রাণহীন। কিন্তু তখনই দেখলাম নিঃশ্বাসের তালে তালে ওর বুকটা ওঠা নামা করছে। বুঝলাম অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওই অস্পষ্ট আলোতেও ওর বীভৎস মুখটা দেখে আমি শিউরে উঠলাম। মানুষের দেহে যেন একটা চিতা বাঘের মুখ বসান। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে মুখটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

আর অপেক্ষা না করে দ্বীপের ভেতর দিকে এগোতে লাগলাম।

কিছুটা যাবার পরই খুব কাছ থেকে পুমার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। একটা বিপদমুক্তির আভাস আমার প্রতিটি স্নায়ুকে বিশ্রামের জন্য উন্মুখ করে তুলল।

যে চীৎকার সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে আসার ফলে এই বিপদ, সেই পুমারই বুকফাটা আর্তনাদ আমার কানে মধুবর্ষণ করল।

সামনেই চোখ পড়ল কটেজের আলো।

কাছে গিয়ে দেখি আমার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দেখি চেয়ারে বসে রয়েছে সুরঞ্জন সেন : কি ব্যাপার, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমাকে প্রশ্ন করল। ও—ব্যস্ত থাকায় আপনার কাছে আসতে পারিনি। এই খানিক আগে আপনার ঘরে এলাম। এসে দেখি আপনি নেই। আমাদের না বলে আপনি বেরিয়ে পড়বেন এটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু এ কি!—এতক্ষণে আমার অবস্থা দেখে ওর মুখ থেকে প্রশ্ন আর বিস্ময় একই সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

আমি ততক্ষণে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়েছি।

: আমাদের দ্বীপের কোন অদ্ভুত বাসিন্দার পাল্লায় পড়েছিলেন নিশ্চয়ই?

: বলুন, এ সবের মানে কি?—উত্তেজিত হয়ে উঠি আমি।

: খুব একটা ভয়ংকর কিছু নয়। আজ থাক। আপনি বড্ড ক্লান্ত, কাল সব বলব।

দারুণ যন্ত্রণায় পুমাটা চীৎকার করে উঠল।. স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল সুরঞ্জনের মুখে।

: আমাকে কে তাড়া করেছিল সুরঞ্জনবাবু? ও কি মানুষ? না পশু?

: আপনার এখন ঘুমনো দরকার। এখন না ঘুমোলে কাল আপনি অসুস্থ

হয়ে পড়বেন।

: শিগগির বলুন কে আমাকে তাড়া করেছিল?—আমার নিজের কানেই কথাটা রূঢ় শোনাল।

: আপনি এখন না ঘুমোলে কোন কথারই উত্তর দেব না। নিন্ চট করে খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সব কথা হবে।

২৪শে জুন ॥

পরশু সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে। ছোট জানলা দিয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। গাঢ় নীল রঙটা জুন মাসের আকাশে ঠিক মানায় না। তা সত্ত্বেও আকাশের দিক চেয়ে থাকতে ভাল লাগছিল। কিছুক্ষণ কুঁড়েমি করে উঠে বসলাম। টেবিলের ওপর দেখি খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে।

খেতে খেতে আগের রাত্রের সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের সেই জীবটা সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহলে পেয়ে বসল আমায়। চোখের ওপর ভাসতে লাগল সেই দৃশ্যগুলো।

হঠাৎ একটা মৃদু কাতরোক্তিতে আমি চমকে উঠলাম। কে যেন থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে। পুমার আর্তনাদ এ নয়। যেন কোন মানুষ তার অসহ্য যন্ত্রণা চেপে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ যাতনার যেন সীমা পরিসীমা নেই।

আমি আর থাকতে পারলাম না। এক ছুটে গবেষণা ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজাটা ভেজান ছিল, হাট করে খুলে গেল।

: থামুন, থামুন—চীৎকার করে উঠল সুরঞ্জন, কিন্তু ততক্ষণে যা দেখার তা আমার দেখা হয়ে গেছে।

একটা কাঠের ফ্রেমে কি একটা লাল মত বাঁধা রয়েছে। সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তার মনুষ্যাকৃতি এক নজরেই বোঝা যায়।

ওকে আড়াল করে দাঁড়ালেন মাধবেন্দ্র সান্যাল। অপরিসীম ক্রোধে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ। তারপরে একটা একরোখা গোরিলার মতই তেড়ে এলেন আমার দিকে।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই রক্তমাখা হাতে পাঁজাকোলা করে

তুলে ফেললেন আমাকে। তারপর এগিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমায় আমার ঘরের মধ্যে। উঃ কী শক্তি ওই বৃদ্ধের।

: সমস্ত জীবনের পরিশ্রম এক মুহূর্তে নষ্ট হতে বসেছিল।

: বুঝতে পারিনি— সুরঞ্জন বলল। আরও কি সব বলে গেল ও।

: এখন সময় নেই —সান্যালের এই কথাটাই শুধু কানে এল।

আস্তে আস্তে কণ্ঠস্বর দুটোই দূরে সরে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভয়ে এবং উত্তেজনায় থর থর করে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সন্দেহের একটা কালো ছায়া আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল। তবে কি এরা মানুষের ব্যবচ্ছেদেই আত্মনিয়োগ করেছে? আর ওই বিকৃতাঙ্গ লোকগুলো কি তারই ফল ?!

আমি শিউরে উঠলাম।

ঘরের সামনে দিকের দরজাটা খোলা দেখে ভাবলাম মুক্তিলাভের এই সুযোগ। মাধবেন্দ্র সান্যাল যে একজন মানুষকেই ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাতে আর আমার সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র।

উঃ কী শয়তান! আমাকে কেমন মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। এরপরেই হয়ত আমার পালা। হয়ত আমার ওপরেও চালাবে ওই পরীক্ষা। এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। অনেক শান্তির, অনেক আরামের।

মানুষের পক্ষে যে বীভৎসতম বিকৃতি সম্ভব তা-ই এরা আমাকে দেবে। অমানুষিক যন্ত্রণার পর আমার যে রূপ প্রকাশ পাবে তাতে কুৎসিততম শোয়াসি-মোদো পর্যন্ত শিউরে উঠবে। বেশীর মধ্যে আমি পাব একটা জান্তব প্রকৃতি। তারপর আমাকে ঠেলে দেবে দ্বীপের ওই সব না-পশু না মানুষের দলে। ধীরে ধীরে আমার মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাবে কিছুকালের জন্যে। সামগ্রিক ভাবে মৃত্যু হবে আমার আত্মার।

পালাতে হবে, পালাতে হবে আমায়। এখন চাই একটা অস্ত্র। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। নাঃ, কোথাও কিছু নেই।

এমন সময় মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল হঠাৎ! চেয়ারটাকে উলটে ফেলে তার থেকে একটা কাঠ খুলে নিলাম এক হ্যাচকা টানে। কাঠটার সঙ্গে একটা পেরেকও উঠে এল। এই একটা সামান্য পেরেকের জন্যেই ওটা বেশ মারাত্মক হয়ে উঠল।

বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দরজাটা খুলতেই সামনে দেখি

সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে। ওর মুখ লক্ষ্য করে সজোরে কাঠটা চালিয়ে দিলাম। মাথা নিচু করে সে যাত্রা কোন রকমে বেঁচে গেল ও। পাশ দিয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

: সমীরণবাবু, সমীরণবাবু! কি করছেন বোকার মত! —সুরঞ্জনের গলা আমার কানে ভেসে এল। উঃ, খুব জোর বেঁচে গেছি। আর একটু হলেই আমাকে দিয়ে গিনিপিগের ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নিত।

আমার নাম ধরে ডাকতে সুরঞ্জন আর ওর আন্দামানের (?) চাকরটা আমার পিছু নিল। আমিও দৌড়তে লাগলাম, তবে কাল যে দিকে গিয়েছিলাম সেদিকে আর নয়।

চড়াই বেয়ে ছুটে চললাম উন্মাদের মত। পেছনে আসছে সুরঞ্জন আর ওর ভৃত্য। দিক পরিবর্তন করে পূবদিকে ছুটতে লাগলাম। সমুদ্রের দিকে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় আমার পা দুটো ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে এল। বুঝতে পারলাম আর বেশীক্ষণ আমার পক্ষে এইভাবে ছোটা সম্ভব নয়। কানের মধ্যে কে যেন একটা ঢাক বাজিয়ে চলেছে সমানে। ফুসফুস দুটো এবার বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

পেছনে অনুসরণকারীদের আর দেখতে পেলাম না। একটা ঝোপের ধারে যখন গা এলিয়ে দিলাম সামনেই চোখে পড়ল সমুদ্রের বিশাল ঢেউ। প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মাথায় শুভ্র ফেনার ছড়াছড়ি দেখে মনে হল একটা বিরাট দানব যেন তার শাদা দাঁতগুলো বার করে প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

শুয়ে শুয়ে ঢেউ গুনতে লাগলাম। এখন কি কর্তব্য তা ভাবতেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! কাজেই সমুদ্রের রূপ দেখতে লাগলাম।

ঢেউগুলো সামনেই আছড়ে পড়ছে তারপর হিস হিস করে ডাঙার ওপর এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সেই দৈত্যটাই ফোঁস ফোঁস করে উঠছে নিষ্ফল আক্রোশে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। কতক্ষণ ঠিক বলতে পারি না। এমনি সময়ে সুরঞ্জনের গলা কানে এল। আমার নাম ধরেই ডাকছে।

তবে ত আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। একটা কিছু করতে হয়। কিন্তু কি করব? দ্বীপে থাকার মধ্যে আছে সুরঞ্জন, ডঃ সান্যাল আর তাঁর সৃষ্ট কতগুলো বিকলাঙ্গ বিকৃত মানুষ।

এ ছাড়া ওদের বন্দুক আছে আর আমার অস্ত্র এই কাঠ।

আর ভাবতে পারি না। দেখাই যাক না কি হয়। সমুদ্রে ডুবেই ত আমার মরে যাবার কথা। এই যে বেঁচে আছি এটা ত সম্পূর্ণ ফাউ।

এক সময় ক্ষিধে তার উপস্থিতি ঘোষণা করল। চারদিকে প্রচুর গাছপালা। কিন্তু এর মধ্যে কোনটার ফল যে খাওয়া চলে তা আমার উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান বলে দিতে পারল না।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। ওরা এবার কুকুর নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। নতুন বিপদ আসছে দেখে তার বিপরীত দিকে দ্রুত চলতে লাগলাম।

খানিকটা যাবার পর কুকুরগুলোর ডাক আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। যাক! ওরা তাহলে অন্য পথ ধরেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি চমকে উঠলাম। ভীষণভাবে চমকালাম। কারণ আমার সামনেই কি একটা ঝপ্ করে পড়ল সামনের গাছটা থেকে।

চমকে ওঠা ভাবটা কাটতে বোধ হয় একটু সময় লেগেছিল কারণ সামনের ওই লালচে প্রাণীটা কথা বলে উঠল : চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনি ত নৌকোর মানুষ।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এ একটা বাঁদর-মানুষ। মানুষ অথচ বাঁদরের মতন হাবভাব। বেশ উৎসুক হয়ে ও দেখতে লাগল আমায়।

: আপনি ত নৌকো করে এসেছেন?

: হ্যাঁ নৌকো করে, জাহাজ থেকে।

ও ততক্ষণে আমার গায়ে হাত দিয়ে দিয়েছে। যেন পরখ করে নিতে চাইছে। ভাল করে দেখতে লাগল আমার ছেঁড়া জামা, ছড়ে যাওয়া হাত পা।

আমার হাতের ওপর এসে ওর হাত এবং দৃষ্টি একই সঙ্গে থেমে গেল। মনোযোগ দিয়ে ও আমার আঙুলগুলো গুনতে আরম্ভ করে দিল।

: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। বাঃ বেশ। পাঁচটা আঙুল। ঠিক আমার মত। ও খুশী হয়ে উঠল।

তারপরেই কি খেয়াল হল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ওর পিছু নিলাম। কিছুটা যাবার পর দেখলাম ও একটা গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছে।

: এদিকে একটু শোন ত। আমি ডাকলাম।

তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এল।

: আচ্ছা বলতে পার খাবার কোথায় আছে ? প্রশ্ন করলাম।

: খাবার ? কেন, মানুষের খাবার খান।

কি প্রশ্নের কি উত্তর !

: মানুষের খাবার যে খেতে হয় তা আমি অল্পস্বল্প জানি। কিন্তু কোথায় আছে সেই খাবার ?

কষ্টে রাগ চাপলাম।

: অল্পস্বল্প জানে। ভাল করে জানে না যে মানুষের খাবারই কেবল খেতে হয়। ও বোকা। কিচ্ছু জানে না।

আমার প্রশ্নের এই উত্তর শুনে হাসব না কাঁদব বেশ কিছুক্ষণের জন্য ঠিক করে উঠতে পারলাম না। তারপর মুখ থেকে আপনা হতেই ধমকের স্বর বেরিয়ে গেল।

: ঠিক করে বল কোথায় আছে সেই খাবার ? এক হাতে তার কব্জি চেপে ধরলাম।

: কেন ? কুটিরে ? ও ফস করে বলে উঠল।

: কিন্তু কোথায় সেই কুটির ? আমি ত নতুন এসেছি।

: আসুন। ও ঘুরে দাঁড়াল।

ওর পিছু পিছু হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত দেখার একটা অদম্য কৌতূহলে পেয়ে বসল আমায়। আমার মনে হল 'কুটিরে' ওর মতন মানুষ আরও অনেকে আছে।

হতভাগ্যের দল ! সান্যালের পাগলামির ফলে আজ এদের এই অবস্থা। কে জানে মানব জীবনের স্মৃতি এদের আজও আছে কিনা।

: তুমি কতদিন আছ এখানে ? আমার সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম।

: কতদিন ? পাল্টা প্রশ্ন করেই ও চুপ করে গেল।

বুদ্ধিসুদ্ধি বলে কিচ্ছু নেই এদের। মানুষকে কি অবস্থায় নামিয়ে এনেছে ওই পিশাচ ডাক্তার। সৃষ্টি নিয়ে ছেলেখেলার ফলেই দেবতা তৈরী করতে গিয়ে এক দানবকে গড়ে বসেছিল আর এক ডাক্তার। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

এদিকে আমার সঙ্গী ঠিক বাঁদরের মতই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। থেকে থেকে আশেপাশের গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খেতে লাগল।

মাঝে মাঝে ওর অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলাম। কিন্তু যা-ই জিজ্ঞেস করি না কেন ও সেইগুলোই পাল্টা প্রশ্ন করে আমায়। ফলে কিছুই জানতে

পারলাম না।

ওর ওইসব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পরে একটা জায়গায় এসে পৌছলাম সেখানে কেবল বড় বড় গাছের সারি। মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা আর সেখানে একটা হলদে আস্তরণ পড়েছে কিসের। খানিকটা ধোঁয়া ভাসছে তার ওপর।

একটা বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এল। গন্ধকের মত গন্ধ অনেকটা। আমার নাক এবং চোখ জ্বালা করে উঠল।

ডানদিকে একটা পাথরের পাশ দিয়ে সমুদ্রের নীল জলের এক অংশ চোখে পড়ল। একটা বাঁক পেরোতেই দেখলাম রাস্তাটা একটা গুহার মুখে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। জমে যাওয়া লাভা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপের নীচে সৃষ্টি হয়েছে এই সঙ্কীর্ণ গুহাপথ।

উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করতেই আমার চোখ দুটো আচমকা অনভ্যাসের অজুহাত দেখাল। শুধু মনে হল পাশ দিয়ে কতকগুলো ছায়া সরে গেল। একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে এল। আলিপুর চিড়িয়াখানার সেই সুপরিচিত গন্ধ।

ততক্ষণে অন্ধকারটা কিছুটা সয়ে আসায় দেখলাম কোথা থেকে দুটো আলোর রশ্মি এসে অন্ধকারটাকে ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

একটা ঠাণ্ডা স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম। মুখ ফেরাতেই একটা লালচে প্রাণী চোখে পড়ল। তার আকৃতি বীভৎস। ছোট ছেলের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিলে যেমন দেখতে হয় একে অনেকটা সেই রকম দেখতে। একটা শ্লথের মত তার হাত পা, ভাব ভঙ্গী সব। ঠিক তেমনি মন্থর গতি। আমার সমস্ত গা-টা গুলিয়ে উঠল। প্রাণীটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

আমার সঙ্গী বাঁদর-মানুষ কখন সরে গেছে খেয়াল করিনি। এবার বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছি। দুপাশে লাভার দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে অল্প পরিসর গলি পথটা। চওড়ায় ছ'সাত ফুটের বেশী হবে না। ইতস্তত ছড়ানো ফলের ছিবড়ে এবং অন্য সব ময়লা জায়গাটাকে অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ করে তুলেছে।

হঠাৎ দেখি বাঁদর-মানুষ একটু দূর থেকে আমায় হাতছানি দিচ্ছে। এমনি সময় বিরাট বড় একটা প্রাণী এসে গুহার মুখটা আড়াল করে দাঁড়াল। আরও একবার আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম। কাঁপতে থাকা হাতে কোন রকমে সেই

চেয়ার থেকে খুলে নেওয়া কাঠটা চেপে ধরার চেষ্টা করলাম। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলাম বাঁদর-মানুষের দিকে। গুহার অভ্যন্তরে।

অর্ধচন্দ্রের মত জায়গাটায় লাভা ও কাঠের পাত্রের ওপর নানা রকমের ফল আর নারকোল রয়েছে। কোথাও কিন্তু আগুন দেখতে পেলাম না।

একটা কোণ থেকে খানিকটা জমাট বাঁধা অন্ধকার কি একটা বলে উঠল আমাকে এগোতে দেখে। বাঁদর-মানুষ আমার হাতে একটা নারকোলের মালা দিল। যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত হয়ে আমি সেটা খেতে আরম্ভ করলাম, যদিও ভয়ে আমার হাত-পা-গুলো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে সেই বিশাল প্রাণীটা তখনও আমায় জ্বলন্ত চোখে দেখছে।

অন্ধকার কোণে আবার একটা শব্দ হল। এবার বাঁদর-মানুষ বলল : ও একজন মানুষ। মানুষ। মানুষ। জ্যান্ত মানুষ। আমাদের মত মানুষ।

: চুপ। অন্ধকার কোণ ধমকে উঠল।

আমি চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলাম।

: এ কি আমাদের সঙ্গে থাকবে? অন্ধকার কোণ থেকে প্রশ্ন এল। গলার স্বরটা অদ্ভুত মোটা আর কর্কশ। বাঁদর-মানুষ আমার দিকে তাকাল।

: আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকতে এসেছি। আমি বললাম।

: এ-ও মানুষ। একেও নিয়ম জানতে হবে। আইন শিখতে হবে। এতক্ষণে যেন অন্ধকার কোণটায় একটা ধূসর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হল।

গুহার মুখটায় আরও কয়েকজন এসে জুটেছে দেখলাম। হঠাৎ ধূসর প্রাণীটা বলে উঠল : বল। চার পায়েতে হাঁটা নিষেধ এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ।

শুনে আমিও অবাক।

: কথাগুলো বল, বাঁদর-মানুষ বলল। অন্য প্রাণীরাও একই কথা বলল ধমকের সুরে। বুঝলাম আমাকেও এই অর্থহীন শব্দগুলো আবৃত্তি করতে হবে। কাজেই ভর্তি হয়ে গেলাম সেই পাগলের পাঠশালায়।

ধূসর প্রাণীটা যেন এক বদ্ধোন্মাদের প্রলাপোক্তির এক এক পংক্তি সুর করে পড়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই মিলে তা বলে যেতে লাগলাম। এই কথাগুলো বলতে বলতে দেখি সবাই ধীরে ধীরে দুলতে লাগল।

আমার মনে হল আমি ভুল করে এসে পড়েছি অন্য এক জগতে। কেউ এর ঠিকানা জানে না। প্রায়ান্ধকার গুহা। দু'একটা আলোর রশ্মিও বোধ হয় ভুল করে এসে পড়ার ফলেই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে বিকলাঙ্গ প্রাণী-

গুলোর দেহ। এরাও একদিন মানুষ ছিল। আর আজ?

সকলে এক সঙ্গে আবৃত্তি করতে লাগলাম। চার পায়েতে হাঁটা নিষেধ, এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ। মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ, এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ, নখ দিয়ে গাছ আঁচড়ানো নিষেধ, এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ। মানুষ তাড়া করা নিষেধ, এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ।

এইভাবে একে একে নিষেধের তালিকা শেষ হল। পাগলামির চূড়ান্ত। এই বিচিত্র নিয়ম প্রত্যেকের ওপর কেমন অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওরা আবৃত্তি করছে ওদের 'আইন'। আমি বাইরে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলাম যেন আমার কতই না ভাল লাগছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা হাসির বোমা ফেটে যেতে না পেরে আমার দম আটকে ধরল।

আবার নতুন সুরে আরম্ভ হল—

যন্ত্রণা-ঘর ওই ওখানে সে ত তাঁরই
তৈরী করে তাঁরই হাত
আঘাত হানে ওই দুহাত
হারামেরও হাত তাঁরই তাঁরই।

এই 'তিনি'টি যে কে তা আর বুঝতে বাকি রইল না। শয়তান ডাক্তার এদের কাছে ভগবান সেজে বসে আছে।

বজ্র হানে তাঁরই হাত
নীল সমুদ্র সে-ও তাঁরই
ঐ যে তারার আবছায়া পথ
সে-ও তাঁরই সবই তাঁরই।

এক সময়ে এই আবৃত্তির পালা শেষ হল। যে আমাদের আবৃত্তি করাচ্ছিল তাকে এবার ভাল করে দেখতে পেলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন পূর্ণ-বয়স্ক মানুষেরই মতন কিন্তু সর্বাঙ্গ তার ধূসর লোমে ঢাকা। আরও সব নানা আকারের আধা-মানুষ আধা-পশু চোখে পড়ল!

কোথায় এলাম আমি? মানুষের মূর্তিমান উপহাস এই সব জীবের মধ্যে কিছুদিন থাকলে আমারও ত মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এদের এই গা-শিউরে ওঠা সান্নিধ্যে একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু আমায় থাকতে হবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্যেই থাকতে হবে এখানে। এড়িয়ে চলতে হবে ওই মানবদেহী পিশাচ ডাক্তারটাকে। বাঁদর-

মানুষের গলার স্বরে আমার অন্যমনস্কতা কেটে গেল। শুনলাম ও বলছে : ও একজন মানুষ। আমার মত পাঁচ আঙুলওয়ালা মানুষ। অন্ধকার থেকে ধূসর প্রাণীটা বলল : চার পায়েতে হাঁটা নিষেধ, এ-ই নিয়ম। আমরা মানুষ।

তারপর তার বিকৃত হাতটা বাড়িয়ে আমার হাতটা তুলে ধরল। আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। অদ্ভুত ধরনের হাত। মনে হয় যেন একটা হরিণের ক্ষুরকে কাটা ছেঁড়া করে হাতের মত তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আতংকে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি।

মাথা নিচু করে ও আমার নখগুলো দেখতে লাগল। তারপর আমায় টানতে টানতে গুহার বাইরে এনে দাঁড় করাল। ওর মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি শিউরে উঠলাম। এত কুৎসিত মুখ আমি কোনদিন দেখিনি। বড় বড় ধূসর লোমের মধ্যে খালি তিনটে গর্ত। দুটো চোখ আর নাক।

: এর নখগুলো ছোট। খুব ভাল। অনেকের বড় বড় নখ থাকে। খুব খারাপ। ঘাড় নাড়তে নাড়তে ও বলল।

হাতটা ছেড়ে দিতেই চেয়ারের কাঠটা বাগিয়ে ধরলাম। যদি কিছু হয়।

: শুধু ফলমূল খেয়ে থাকবে। এই তাঁর ইচ্ছে। বাঁদর-মানুষ কিচির-মিচির করে উঠল।

: আমি নিয়ম শেখাই। যারা নতুন আসে আমার কাছে আইনকানুন শেখে, ধূসর প্রাণীটি বলল।

: ঠিক বলেছে। কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল।

: নিয়ম মেনে না চললে কেউ রেহাই পায় না, সকলে একসঙ্গে বলে উঠল।

: আমি একবার নিয়মগুলো বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম, বাঁদর-মানুষ বলতে লাগল। তারপরেই একদিন হাতটা পুড়ে গেল। এখনও দাগ আছে। তিনি মহৎ। তিনি ভাল। কেউ রক্ষা পাবে না।

: কেউ রক্ষা পাবে না, সমস্বরে উচ্চারিত হল।

: কেউ না, কেউ না, বাঁদর-মানুষ বলে উঠল।

: অনেকে চলন্ত জিনিষের পিছু নেয়, ধূসর প্রাণীটা বলতে লাগল। তারপর অপেক্ষা করে করে এক সময় সেটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তার রক্ত খায়। খারাপ। খুব খারাপ এ সব। মাছ, মাংস খাওয়া উচিত নয়। ওসব খায় পশুরা। আমরা ত মানুষ।

: কেউ কেউ নখ দিয়ে গাছ আঁচড়ায়, এবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

থাকা সেই বিরাট জীবটার গলা শোনা গেল। কেউ আবার মাটি খুঁড়ে মড়া বার করে।- কখনও কখন অতর্কিতে কামড়ে দেয়। খুব খারাপ।

: শাস্তি পেতে হবে নিয়ম মেনে না চললে। কাজেই নিয়মগুলো ভাল করে শেখ। ধূসর প্রাণীটা আমায় সাবধান করে দিল।

তারপর আবার স্বর করে করে তার নিয়মের তালিকা পড়তে আরম্ভ করল। আরও একবার আবৃত্তি করতে হল আমায়।

বেয়াড়া চীৎকারে আর দুর্গন্ধে আমার মাথা ধরে এসেছিল। এমন সময় আইন পড়ার মাঝখানেই একজন শুয়োব মানুষ খুব উত্তেজিত হয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল। বাঁদব-মানুষকে কি একটা বলল সে। তারপর দেখলাম দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। বাকি সবাইও ওদের অনুসরণ করল একে একে।

সব শেষে বেরিয়ে এলাম আমি। বাইরে আসতেই কানে এল দুটো স্ট্যাগহাউণ্ডের চীৎকাব। বুঝলাম সান্যালের কুকুর। শক্ত করে ধরলাম হাতের অস্ত্র (?)।

সামনে একগাদা মানুষ পশুর সংমিশ্রণ দাঁড়িয়ে। তাদের বিকৃত ঘাড় এবং কাঁধ পেরিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে ওদের মধ্যে দেখলাম একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলেছে।

আর ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম। দেখলাম কিছুদূরে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাধবেন্দ্র সান্যাল এবং স্বরঞ্জন সেন। সান্যালের হাতে দুটো স্ট্যাগহাউণ্ডের চেন ধরা।

মুহূর্তমাত্র আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই কোন রকমে সামলে নিয়ে কয়েক গজ দূরে একটু সরু পথের দিকে ছুটে গেলাম। এই পথটা লাভার দেওয়ালে এক ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা গেছে।

: থামুন। সান্যালের গলা কানে এল। ধর ধর, ওকে ধরে ফেল।

এক এক করে প্রত্যেকটা মানুষ জন্তু আমার দিকে তাকাল। মানুষের মত ওরা ক্ষিপ্র নয় বলেই বোধ হয় আমি খানিকটা সময় পেয়ে গেলাম। শেষে ওরা যখন আমায় ধরতে এল হাতের কাঠটা এলোপাথাড়ি এমন চালালাম যে কয়েকজন বেশ জখম হল।

তারপরেই সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তা বেয়ে আরও একবার আরম্ভ হল আমার প্রাণ বাঁচানোর দৌড়। পেছনে শুনতে পাচ্ছি ধেয়ে আসছে একটা সম্মিলিত 'ধর ধর' শব্দ।

গন্ধকে ঢাকা জায়গাটায় এসে আমি মুহূর্তের জন্যে পেছন দিক তাকিয়েছিলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল আঁকাবাঁকা রাস্তাটা দিয়ে মানুষ-জন্তুদের আসতে অসুবিধে হচ্ছে।

এবার গতিবেগ একটু কমালাম। পশু-মানুষদের গর্জন কানে আসছে। হয়ত আমায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। কাজেই থামা চলবে না।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেই সঙ্গে আমিও নিচের দিকে ছুটে চললাম। সামনের কিছু বড় বড় আগাছা ডিঙিয়ে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে উপস্থিত হলাম। পায়ের তলার মাটিটা ভিজে।

আধ মিনিট বোধ হয় দাঁড়িয়েছিলাম আর টানতে না পারা দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিতে। তারপরেই আবার ক্রশ কান্ট্রি রেস।

পেছনে জান্তবাকৃতির মানুষগুলোর হিংস্র চীৎকার এখন আর আমাকে বিচলিত করতে পারছে না। বার বার বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফলেই বোধ হয় আমার স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গেছে।

রাস্তাটা এবার ডানদিকে ঘুরে গেছে। স্ট্যাগহাউণ্ডগুলো শিকার ধরতে না পেরে আক্রোশে প্রচণ্ড চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। নিজের অজান্তেই কখন গতিটা বাড়িয়ে দিয়েছি খেয়াল করিনি।

এইভাবে দৌড়ে একটা জায়গায় গিয়ে পড়লাম যেখানে কেবল ছোট ছোট গাছের ছড়াছড়ি। মরিয়া হয়ে তারই মধ্যে দিয়ে ধেয়ে চললাম।

বেশ জোরেই ছুটে চলেছি এমন সময় আমার পা-টা পিছলে গেল। তারপরেই মনে হল আমি অন্তহীন পাতালের মধ্যে নেমে যাচ্ছি। পড়ছি ত পড়ছিই, থামার কোন লক্ষণ নেই।

থামলাম যখন অনুভব করলাম চারদিকে নরম কাদা। মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকা চরকি যখন থামলো, আমি বুঝতে পারলাম মাটির মধ্যে একটা ফাটলের ভেতর পড়ে গেছি। ঘন আগাছার মধ্যে গর্তের মুখটা আড়াল ছিল, কাজেই দেখতে পাই নি। গর্তটা প্রায় কুড়ি ফুট গভীর। নরম মাটি ছিল বলেই হাত পা ভাঙেনি। গর্তটা লম্বায় বেশ বড়। একটা দিক ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে।

আমি অবশ্য ওঠার চেষ্টা না করে যেভাবে ছিলাম সেই ভাবেই পড়ে রইলাম। উঠে দাঁড়াবার শক্তিও সেই মুহূর্তে ছিল না। কেউ যেন নিঙড়ে নিঙড়ে আমার প্রতিটি ফোঁটা শক্তি বার করে নিয়েছে। চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ বাদে একটা দারুণ গোলমাল গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। .

আরও অনেক পরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডান হাতটা ব্যথা করতে লাগল। দেখলাম মচকে গেছে। গর্তটার ঢালু দিকটা দিয়ে ওপরে উঠে এলাম।

কিছুটা যেতেই সেই ছোট খালটা চোখে পড়ল। সমুদ্রের ধারে পৌঁছবার আশায় এর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তিলে তিলে পশুতে পরিণত হওয়ার চেয়ে সমুদ্রে ডুবে মরা অনেক ভাল।

হঠাৎ হাতটা কি রকম খালি খালি মনে হল আর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল হাতের অস্ত্রটা যেন কোথায় পড়ে গেছে। খোঁজা বৃথা। কাজেই এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল নীল সমুদ্রের জলে লক্ষ সূর্যের প্রতিফলন। সামনেই মৃত্যু।

এদিকে আমি প্রচণ্ড হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে যেন দেহ থেকে একটা গোটা নক্ষত্রের তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেন জানি না মৃত্যুর কথা হঠাৎ ভুলে গেলাম। হয়ত মাথায় তখন অন্য চিন্তা এসেছিল বলেই। যে দিক থেকে এসেছি সেই দিকেই ফিরে দাঁড়ালাম।

কান পেতে শুনতে পেলাম বহুদূরে একটানা ডেকে যাচ্ছে স্ট্যাগহাউণ্ডগুলো। গোলমালটাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তার মানে ওরা সমুদ্রের তীর বরাবর আমায় খুঁজছে।

এইবেলা আমি যদি ওদের কটেজে গিয়ে কোন একটা অস্ত্র নিয়ে আসি তাহলে ত আরও কিছুদিন যুঝতে পারা যায়। দরজা বন্ধ থাকলে না হয় ভেঙে বা অন্য কোনভাবে ঢোকার চেষ্টা করব।

একটা রিভলবার বা পিস্তল হাতে পেলে একটু অন্তত দেখাতে পারব যে আমার জীবনেরও একটা দাম আছে আর সেটা নেহাৎ কম নয়। মরার আগে ওদের দুজনের একজনকে মেরে তবে মরব।

কটেজের পথ ধরলাম।

নানান্ কথা চিন্তা করতে করতে হাঁটছি এমন সময় সামনের একটা ঝোপকে ঠেলে সরিয়ে অনেকগুলো প্রাণী একে একে বেরিয়ে এল। সবার আগে সান্তাল

আর সুরঞ্জন।

চমকে উঠেই বুঝলাম ভুল পথে এসেছি। কটেজের দিকে না গিয়ে অন্যমনস্কে সমুদ্রের সমান্তরাল পথে হেঁটেছি। অবস্থাটা ভাল করে বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের দিকে 'দে ছুট্!'

ওরাও তেড়ে এল। দু'একটা ডালপালা সরাতেই সামনে দেখলাম গম্ভীর সমুদ্র তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সোজা গিয়ে জলে নেমে পড়লাম।

: ও কি মশাই করছেন কি? সুরঞ্জনের গলা শুনতে পেলাম জল যখন আমার কোমর ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। ঘুরে দাঁড়ালাম। ও আবার কি একটা বলে উঠল।

: কি করছি দেখতে পাচ্ছ না শয়তান। মরতে যাচ্ছি। ডুবে মরতে যাচ্ছি। তোমাদের অমানুষিক অত্যাচারের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। একটা পশুতে পরিণত হতে আমি মোটেই রাজী নই। এতগুলো কথা বলে আমি হাঁপাতে লাগলাম।

: কি বলছেন আপনি! সান্যাল বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা করল।

: কি বলছি আমি বুঝতে পারছ না? আমি যা দেখেছি, ওই হতভাগ্য প্রাণীগুলো, যারা নাকি একদিন সুস্থ সবল মানুষ ছিল, মানুষ-জন্তুদের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলতে লাগলাম, তাদের তোমরা পশুতে পরিণত করেছ—

: চুপ, চুপ—সান্যাল আমাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

: কেন চুপ করব? এখন আমি মরতে যাচ্ছি, কাজেই সব কথা ওদের জানিয়ে যাব। শোন সবাই, তোমরা কি জান না এই দুজন লোক তোমাদের ভয় করে চলে? জন্তু-মানুষদের আমি বলতে লাগলাম, তাহলে তোমরা কেন ওদের ভয় পাও? ওদের চেয়ে তোমাদের দেহে শক্তি অনেক বেশী।

: সমীরণবাবু, দোহাই আপনি থামুন, বুঝবেন না কি সর্বনাশ আপনি করছেন। সমস্বরে সান্যাল এবং সুরঞ্জন চীৎকার করে উঠল যাতে আমার কথাটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ওদের যা শোনার তা ওরা শুনে নিয়েছে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল পশু-মানুষের দল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা আলোড়নের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে ওদের মধ্যে। কয়েকজনের মুখ অস্বাভাবিক রকমের থমথমে! ওদের বিকৃত হাতগুলো ঝুলে পড়েছে। কুঁজো হয়ে কি সব বলাবলি করছে ওরা। বোধ হয় আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা

করছে কিংবা হয়ত ওদের সুস্থ মানবজীবনের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমি চীৎকার করে অনেক কিছুই বলে গেলাম। বললাম, সান্যাল আর সুরঞ্জনকে ভয় করার কিছু নেই। ওদের এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। এই কথাগুলোই ভাল করে পশু-মানুষদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ওরা জলের ধারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো শুনতে লাগল। কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ চেঁচানো যায় না। কাজেই থামতে হল দম ফুরিয়ে যাওয়ায়।

: আমার একটা কথা দয়া করে শুনুন। তারপর না হয় যা ইচ্ছে করবেন। সান্যালকে বলতে শুনলাম।

: বেশ বলুন, কি বলবেন, একটু ভেবে আমি বললাম।

একটু হাসলেন ডঃ সান্যাল। তারপর কি ভেবে নিয়ে ইংরিজীতে বলতে শুরু করলেন : আমি ইংরিজীতে বলছি যাতে এরা বুঝতে না পারে। আপনি এতক্ষণ যা ভেবে এসেছেন আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আমি মানুষকে পশুতে পরিণত করিনি, পশুর থেকে মানুষ গড়ে তোলারই এক ব্রত—

: থাক থাক, আর বাজে ছেঁদো কথায় কাজ নেই। একেবারে সুমহান ব্রত! যেন স্বর্গে পৌছনোর সর্টকাট রাস্তা! যান্ যান্ ওসব গল্প অন্য লোককে বলবেন। ওই মানুষ-জন্তুগুলোই কেবল আপনার কথা বিশ্বাস করবে। ওরা কথা বলে, বাড়ী তৈরী করে। নিশ্চয়ই সবাই একদিন পরিপূর্ণ মানুষ ছিল। আপনাদের পাল্লায় পড়েই ওদের আজ এই অবস্থা।

: আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক তার পরেই গভীর জল। অসংখ্য হাঙর আছে ওখানে সুরঞ্জন বলল।

: বেশ আমিও ত তা-ই চাই। আপনাদের ছুরির স্পর্শের চেয়ে হাঙরের দাঁতও যে অনেক মোলায়েম।

হঠাৎ সান্যাল নিজের আর সুরঞ্জনের রিভলবার দুটো বালিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন : ওই পড়ে রইল আমাদের বন্দুকগুলো। এখন আমরা কতদূর সরে গেলে আপনি নিশ্চিন্তে ডাঙায় আসতে পারেন? দুটো রিভলবারই আপনার দখলে থাকবে। আসুন নিন ওগুলো।

: না, আমি আপনাদের বিশ্বাস করি না।

: আচ্ছা, একটা কথা আপনি কেন ভাবছেন না সমীরণবাবু, আপনার কোন অনিষ্ট করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হত তাহলে খাবারের সঙ্গে ওষুধ

মিশিয়েই আমরা কাজ সেরে নিতাম। একটু ভেবে দেখুন আপনি। আর এতক্ষণ যে আপনার পেছনে ধাওয়া করছি সে-ও আপনারই ভালর জন্যে। এই দ্বীপের আনাচে কানাচে আপনার মত নতুন আগন্তুকদের জন্যে বিপদ লুকিয়ে আছে। আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, আসুন রিভলবার দুটো তুলে নিন। এতগুলো কথা বলে সান্যাল হাঁপিয়ে উঠলেন।

আমি ভেবে দেখলাম সত্যিই কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে। মুখে অবশ্য বললাম : তবে যে কটেজে দেখলাম…

: আরে ওটা ত পুমাটা…আমাকে শেষ করেতে না দিয়েই সুরঞ্জন বলে উঠল।

সান্যালকে অবিশ্বাস করলেও সুরঞ্জনের কথাটা কেন জানি না বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। বললাম : বেশ, তবে মাথার ওপর হাত তুলে দূরে সরে যান।

: না তা পারি না। সেটা অসম্মানজনক। তবে দূরে সরে যাচ্ছি।

মানুষ-জন্তুর দলও ওদের সঙ্গে পিছিয়ে গেল। কিম্ভুত জীব! এই দিনের আলোতেও কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে ওদের। ওদের লক্ষ্য করে সুরঞ্জন একবার সপাং করে চাবুকের আওয়াজ করতেই ওরা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

যখন বুঝলাম সুরঞ্জন আর সান্যাল নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি ডাঙায় উঠে রিভলবার দুটো হাতে তুলে নিলাম। একটা ফাঁকা আওয়াজ করে দেখে নিলাম সব ঠিক আছে কি না।

তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কটেজের পথ ধরলাম আমরা। ওদের দুজনের পেছন পেছন আমি এগোতে লাগলাম। রিভলবার দুটো দুহাতে শক্ত করে ধরা।

কটেজে পৌঁছে আমার ঘরটাতেই বসা হল। ওরা একদিকে। আমি রিভলবার হাতে তার বিপরীতে।

: এবার আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব! সান্যাল বলতে লাগলেন, তবে আগেই বলে রাখি, এই শেষবার আপনাকে বাঁচানো হল। এরপরেও যদি কোনদিন এই রকম অবস্থা উপস্থিত হয় তাহলে কিন্তু আমরা আর ছুটে যাব না। একটু চুপ করলেন ডঃ সান্যাল। ডান হাতে ধরে থাকা চুরুটটা ধরাতে একটু সময় লাগল। আপনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যে জীবটাকে দেখেছিলেন সেটা

আসলে পুমা। খানিক পরে আপনাকে দেখিয়ে দেব।

: হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করছি ও পুমাই। কিন্তু কেটে ছিঁড়ে কী অবস্থা করেছেন ওর। আমার সবচেয়ে বড় শত্রুরও যেন কোনদিন ওরকম অবস্থা না হয়। এ ধরনের জঘন্য···

: ওসব কথা থাক। ছোট ছেলের মত কথা বলছেন আপনি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল ডঃ সান্যালের চোখে মুখে। এখন শুনুন আপনাকে ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে কয়েক কথা বলব।

ধীরে ধীরে তাঁর গলার স্বরে পরিবর্তন এল। বলতে বলতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডঃ সান্যাল। আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম ঐ প্রাণীগুলো কোনদিনই মানুষ ছিল না। ওরা সবাই পশু ছিল। জীব ব্যবচ্ছেদের ফলে প্রায় মানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

: একজন নিপুণ জীব ব্যবচ্ছেদকারী জীবন্ত প্রাণীর দেহে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারেন। ডঃ সান্যাল বললেন, আমি এক এক সময় অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে আমার আগে কেউ কেন এই কাজে হাত দেয় নি। ছোটখাট ব্যাপার হয়ত সফল হয়েছে কিন্তু এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা অচিন্তিতই থেকে গেছে। আপনি জানেন কোন বিকৃত অঙ্গ অস্ত্রোপচারের ফলে আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

: তা ত জানি, কিন্তু ওই কুৎসিত প্রাণীগুলো যে···

: ওদের কথাই বলছি, একটু ধৈর্য ধরুন। আমাকে শেষ করতে না দিয়েই সান্যাল বলে ওঠেন, প্লাষ্টিক সার্জারির কথাও নিশ্চয়ই জানেন। এ ত গেল একই প্রাণীর দেহের বিভিন্ন জায়গার চামড়া, অস্থি নিয়ে জুড়ে দেওয়া। অন্য প্রাণীর দেহ থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন অংশও কাজে লাগে অনেক সময়। এই যে সব অদ্ভুত জীব আপনি দেখলেন, এদের নানাভাবে কাটাকুটি করে মানুষের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। অনেক সময়ে দুটি বিভিন্ন জন্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছি। যেমন হায়েনা-শুয়োর। বহু বছরের সাধনার ফল এরা। সারা জীবনের গবেষণা নিয়োগ করেছি এই কাজে। একটা কথা আপনাকে বলি। নতুন কোন কথা কিন্তু আপনাকে শোনালাম না। 'ভিভিসেকশনেরই গোড়ার কথা এ সব।

কোন প্রাণীর চেহারারই শুধু নয় তার মধ্যেকার রাসায়নিক অবিস্থিতিরও

স্থায়ী পরিবর্তন আনতে আমি সক্ষম। এর একটা উদাহরণও ভ্যাক্সিনেশন যা আজকে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রঙের দেহান্তরকরণও অনেকটা এই রকম। আর এর থেকেই আমার গবেষণার শুরু। বর্তমান গবেষকরা এই দিকটায় বেশী নজর না দেওয়ায় আমিই বোধ হয় প্রথম এতে হস্তক্ষেপ করি।

: কিন্তু এই প্রাণীগুলো যে কথা বলে, আমি বললাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে সে কি করে সম্ভব তা ত বুঝলাম না।

: বাঃ কথা বলবে না! ওদের মস্তিষ্কে কি এমনি এমনি ছুরি চালালাম? পরিশোধিত মগজে একটা শুয়োরকে দিয়েও কথা বলান সম্ভব।

শারীরিক গঠনের চেয়ে মানসিক গঠন অনেক বেশী পরিবর্তনশীল। সংবেশন খুব উন্নত বিজ্ঞান। অনেক পুরনো অসভ্য, অনেক বদ্ধমূল ধারণা সে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। আমরা যাকে 'মরাল' বলি সেটাও অনেকটা কৃত্রিম মানসিক পরিবর্তনের ফল। যথাযথ শিক্ষা একজন কলহ-প্রেমিককেও নিতান্ত ভাল মানুষ করে দিতে পারে।

মানুষ আর বাঁদরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল বাঁদর তার মনের ভাবকে বাক্যে প্রকাশ করতে পারে না। বাঁদরের মধ্যে যদি কথা বলার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা যায় তাহলে বাঁদর আর মানুষের ব্যবধান অনেক কমে যাবে।

এই বিষয়ে আমি সান্যালের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। উনি অবশ্য আমার কথাটা অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে গেলেন।

: আচ্ছা, আপনি মানুষের আকৃতিকেই আদর্শ বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? আমি প্রশ্ন করলাম, প্রাণীর দৈহিক এবং মানসিক উন্নততর রূপান্তরই ত আপনার লক্ষ্য ছিল। তবে অন্য কোন রকম না করে এদের কেন মানুষের মত গড়ার চেষ্টা করলেন?

: ওটা নিতান্ত দৈবক্রমেই ঘটে গেছে। হয়ত আমি মানুষ বলেই মানুষের গঠন আমার কাছে বেশী সুন্দর এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়। নয়ত আমি যে কুকুরকে ভেড়া আর ভেড়াকে ছাগল করতে পারতাম না তা নয়। একটু চুপ করলেন ডঃ সান্যাল, তারপর আবার বলতে লাগলেন, এতগুলো বছর যে কেমন করে কেটে গেল টেরই পেলাম না! এখনও কত কাজ বাকি। তার ওপর আপনার পেছনে ছুটে আজকের দিনটাও মাটি।

আমার নিজেকে ভীষণ কুণ্ঠিত লাগল। খানিক আগে অন্যমনস্কে যে

রিভলবার দুটো সামনের টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

: এবার আপনাকে আমার গোড়ার দিককার পরীক্ষাগুলোর কথা বলব, সান্যাল বললেন, প্রথম যা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তা হল একটা ভেড়া। সেবার আমারই একটা ভুলের ফলে সেটা মারা যায়। তারপর আর একটা ভেড়া নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। এবার কিন্তু মোটামুটি সফল হলাম আমি। মানুষের মতনই দেখতে হল ও। তবে যে ব্যাপারে একটা খুঁত থেকে গেল তা হল ওর বুদ্ধি। বুদ্ধির ক্ষেত্রে ও মোটেই ভেড়ার চেয়ে উন্নত হল না। আর তাছাড়া আমাকে ও যন্ত্রণাদাতা হিসেবেই চিনে রেখেছিল। ফলে আমায় দেখলেই অসম্ভব ভয় পেত।

এরপর একটা গোরিলাকে নিয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে কাজ এগোতে লাগল। সেই হল আমার প্রথম এবং শেষ পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি।

তার মধ্যে সব থেকে বেশী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার মস্তিষ্কে। অনেক কিছু জুড়ে, অনেক কিছু বাদ দিয়ে তৈরী হয়েছিল ওর মগজ।

শেষকালে ওকে অনেকটা নিগ্রোজাতীয় মানুষের মত দেখতে হয়েছিল।

পুমার চীৎকার শুনে আপনি যেমন বিচলিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বিচলিত হয়েছিল স্বরঞ্জন সেদিন গোরিলাটার মানুষের মত আর্তস্বরে।

অনেকদিন, প্রায়, তিন চার মাস ধরে তাকে নানান্ জিনিস শেখাতে লাগলাম। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান হল। শুনতেও শিখল সে, কিন্তু আস্তে আস্তে। খুব সময় লাগছিল। আমি অবশ্য হতাশ হইনি। কারণ এমন অনেক লোক দেখেছি যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি অবিশ্বাস্য রকমের অল্প।

মানুষ হবার আগে ও যে কি ছিল তার কিছুই ওর মনে রইল না। সম্পূর্ণ নতুন জন্ম হল। তারপর ধীরে ধীরে একদিন তার গায়ের ঘাগুলো শুকিয়ে গেল যদিও সর্বাঙ্গে তার পরেও প্রচণ্ড ব্যথা ছিল।

এইভাবে যখন সে কথা বলতে শিখল তার শিক্ষার ভার ছেড়ে দিলাম কয়েকজন আন্দামানীয় ভৃত্যের ওপর।

: এখন সে কাজ করে সে নাকি? আমি প্রশ্ন করলাম।

: না। যাকে আপনি আন্দামানের লোক বলে জানেন, আসলে সে-ও আমারই হাতে সৃষ্ট।

'যাইহোক, সেই গোরিলা মানুষটার শিক্ষার ভার তারপর আন্দামানী লোকগুলোই নিল। গোড়ায় একটু ভয় পেলেও শেষে ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের।

'ওরা ওকে ঘর তৈরী করতে শেখাল। নিজে হাতে ও একটা কুঁড়ে তৈরী করল। বলতে গর্ব হয়, তার ঘরটা আন্দামানীদের ঘরের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছিল।

'আস্তে আস্তে তার মধ্যে নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ লক্ষ্য করলাম। ক্রমশ সভ্য হয়ে আসতে লাগল সে।

'এরপর কিছুদিন বিশ্রাম নিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা সভাজগতকে জানাতে ইচ্ছে হল। ভাবলাম, দেখুক জানুক সবাই। কিন্তু পরে ঠিক করলাম আরও উন্নত মানুষ সৃষ্টি করে তা প্রকাশ করব। সমগ্র পৃথিবী চেয়ে দেখবে বাঙালী বিজ্ঞানীর অসামান্য কৃতিত্ব!

'কিন্তু কি যে হয়, মানুষের স্বভাব এদের বেশীদিন থাকে না। পাশবিক ভাবটাই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ওদের মধ্যে। আগেকার পশুটাই আবার ফিরে আসে ওদের আচরণে। অবশ্য আরও উন্নত মানুষ আমি তৈরী করব। সেই পুমাটাই—'

'থাক সে কথা। আন্দামানের লোকগুলো সবাই মারা গেছে নানান্ ভাবে। কাজেই এদের দেখাশোনা করা আর সর্বদা সম্ভব নয়।

ডঃ সান্যাল বোধ হয় দম নিতেই একটু থামলেন। আমার মধ্যেকার চাপা বিস্ময়টা নির্ঘাত আমার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল কারণ সান্যাল একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'কুড়ি বছর ধরে আমার গবেষণা সমানে চলেছে। ন'বছর দেশে আর এগার বছর এখানে কিন্তু আজও ঠিক মনের মত ফল পেলাম না।'

'প্রতিবারই ভাবি এবার নিশ্চয়ই সফল হব, কিন্তু আমার সৃষ্টি বয়ে বেড়ায় সমান বিফলতা। অনেক সময় আমার ক্ষমতানুযায়ী কাজ করে উঠতে পারি না। একটা চিরকেলে আফশোষ যেন আমার পিছু নিয়েছে। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বার বার। কাজ হয়ে যাওয়ার পরে বুঝতে পারি আমার ভ্রান্তি। কিন্তু পরের বার সেই ভুল শুধরে নিলেও অন্য কোথাও হিসেবে মেলে না।

'মানুষের আকৃতি দিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না, অসুবিধে হয় হাত দুটো

নিয়ে। কারণ বেদনার অনুভূতি সেখানে খুবই তীব্র। সবচেয়ে মুস্কিলে পড়ি, অবশ্য মস্তিষ্কের ওপর কাজ করার সময়। আর সব থেকে সাবধানতার প্রয়োজনও এখানেই।

'এত সে সূক্ষ্ম জায়গা যে সেখানে একটুখানি ভুল পরে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যই, মনে হয়, আমার সৃষ্ট জীবগুলোর বুদ্ধিসুদ্ধি এত অল্প।

'এর চেয়েও আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ওদের সেন্টিমেন্টে। ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ববিরোধী কতগুলো ভাব সারাক্ষণ সুপ্ত থাকে। সামান্যতম সুযোগ পেলেই সেগুলো এক এক করে বেরিয়ে পড়ে। তখন এরা রাগে, ভয়ে, ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

'আপনার নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে এদের এই অবস্থায় দেখে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, একজনের ওপর যখন কাজ শেষ হয়ে যায় ঠিক সেই সময় কিছুদিন তাকে মানুষের মতই দেখতে থাকে। তারপরে আরম্ভ হয় পরিবর্তন। পরিবর্তিত হবার ফলে যা দাঁড়ায় তা আপনি দেখেছেন।

'যাইহোক, আমার ভুল আমি সংশোধন করবই! তাতে হয়ত সময় লাগবে, তা লাগুক। আর যদি কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি মারা যাই তাহলেও আমার উত্তরসূরী নিশ্চয়ই সফল হবে আমার প্রদর্শিত পথে।

'তবে আমার বিশ্বাস আমার জীবিতাবস্থাতেই এর চূড়ান্ত সাফল্য আসবে।

'অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি আমি। পুমাটাই, আমার বিশ্বাস, সব কিছু ঠিক করে দেবে।' একটু থেমে ডঃ সান্যাল আবার বললেন। 'দেখি কি হয়!'

অনেকগুলো মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। তারপর আমিই প্রশ্ন করলাম: কাজ হয়ে গেলে বুঝি ওদের ওই কুটিরে পাঠিয়ে দেন?

: ওরা নিজেরাই চলে যায়। যখন দেখি ওদের মধ্যে জান্তব প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে আমি তাড়িয়ে দিই। ওরা গিয়ে হাজির হয় ওই কুটিরে।

'কয়েকজনকে দিয়ে অবশ্য চাকরের কাজ করিয়ে নিই। আর একটা ব্যাপার বলি আপনাকে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা কিন্তু আর এই কটেজের ছায়াও মাড়ায় না। এটার নাম দিয়েছে 'যন্ত্রণাঘর'। আমাকে

আর কটেজকে ওদের ভীষণ ভয়। আমিও ওদের অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমার কাজের মূর্তিমান বিফলতা ওরা। সুরঞ্জন অবশ্য আরও ভাল করে জানে এদের। আসলে সুরঞ্জন ওদের ভাল বেসে ফেলেছে।' সুরঞ্জনের দিকে চেয়ে উনি বললেন, 'কি সুরঞ্জন, তাই না ?'

স্মিত হেসে বোধহয় সম্মতি জানাল সুরঞ্জন। ডঃ সান্যাল বললেন : 'একটা মজার ব্যাপার বোধহয় আপনি লক্ষ্য করেছেন। ওদের কতগুলো নিয়ম আছে। 'তাঁর' উদ্দেশে ওরা স্তোত্র পাঠ করে। ওরা নিজেরাই বাসস্থান তৈরী করে। বিয়ের ব্যাপারটারও চল্ আছে ওদের মধ্যে। এসব দেখে ওদের মনের মানবিক দিকটা অধিকতর প্রবল বলে মনে হয়। কিন্তু আমিও ওদের জানি, ওদের মনের গভীরতম প্রদেশেও আমার দৃষ্টি প্রসারিত। আমি জানি, ওরা সাধারণ মুমূর্ষু পশু।

'এই পুমাটার ওপর আমার অনেক ভরসা আছে। এর ব্রেনের ওপর অমানুষিক পরিশ্রম করেছি আমি।" চুপ করলেন ডঃ সান্যাল। তারপর খানিক বাদে টেনে টেনে জিজ্ঞেস করলেন। 'কি সমীরণবাবু? এখনও কি আপনার ভয় রয়েছে নাকি ?'

ডঃ সান্যালের দিকে আমি তাকালাম। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। তাঁর শান্ত স্থির দৃষ্টি একটা সুন্দর গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে তাঁকে।

রিভলবার দুটো ফিরিয়ে দিলাম।

: আপনার কাছেই থাক্, ডঃ সান্যাল বললেন, এই দুদিনে আপনার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। এখন একটা টানা ঘুমের দরকার আপনার। একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই হল, আজ সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। যান, এবার বিশ্রাম করুন গিয়ে।

ঘরে এসে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিছানার আশ্রয় নিলাম, এবং বোধ হয় দশ গোনার মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম।

২৫শে জুন ॥

বেশ বেলাতে ঘুম ভাঙল। আর সঙ্গে সঙ্গেই কালকের ঘটনাগুলো সব চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিছুক্ষণ কুঁড়েমি করে উঠে পড়লাম।

মুখ ধুয়ে সবে ঘরের মধ্যে এসেছি, এমন সময় পেছন দিকে সুরঞ্জনের গলা শুনতে পেলাম : সুপ্রভাত, কেমন আছেন ?

: ভালই, খুব ঘুমিয়েছি রাত্রে।

: ঘুমের দরকার ছিল আপনার। চলুন, চা খাওয়া যাক।

আমরা পাশের ঘরে গেলাম। পুমাটার আজ বিশ্রামের দিন। তার ঘা শুকোবে। তবু কিন্তু ডঃ সান্যাল আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিলেন না। অত্যন্ত নির্জনতাপ্রিয় তিনি।

দ্বীপের অর্ধমানুষগুলো সম্বন্ধে আরও জানবার জন্যে আমি সুরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলাম।

: আচ্ছা, এই যে একের পর এক অদ্ভুত জীব আপনারা তৈরী করছেন ; আমি জিজ্ঞেস করলাম ; এরাও দেখছি বেশ শক্তিশালী কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন আপনাদের আক্রমণ করে না ? এদের ভুলিয়ে রেখেছেন কিভাবে ?

: ওদের বুদ্ধি ত, কাল শুনলেনই অত্যন্ত সীমিত, যদিও শেষের দিককার পশু-মানুষগুলো কিছুটা উন্নত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। ওদের পশুত্বও খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়, কিন্তু কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা ওদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ওদের কল্পনা তাকে অতিক্রম করতে পারে না।

'কিন্তু যেগুলো ওদের মজ্জাগত অভ্যেস এবং আমাদের প্রতিকূলে, সেগুলোকে কায়দা করা হয়েছে অন্যভাবে। এই অভ্যেসগুলোর বিপরীত কতগুলো আইন করে দেওয়া হয়েছে এবং ওদের বোঝান হয়েছে এই সব আইন অমান্য করা অমার্জনীয় অপরাধ।

'আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে ওরা রক্তের স্বাদ না পায়। রাত্রেই সাধারণত ওদের ভেতরকার পশুটা বেশী করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ রাত্রির অন্ধকারে ওরা এমন অনেক কিছুই করে বসে যা দিনের আলোর কল্পনাও করতে পারে না।'

এবার আমি বুঝতে পারলাম প্রথম রাত্রে চিতা-মানুষ কেন আমায় তাড়া করেছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর ॥

আজ তিন মাসের ওপর হয়ে গেল এই মানুষ-জন্তুর দ্বীপে রয়েছি আমি। এ ক'মাসে অনেক বৈচিত্র্যই লক্ষ্য করলাম।

গোড়ার দিকে এই পশু-মানুষগুলোকে ভীষণ ভয় পেতাম। কিন্তু কবে থেকে জানি না, আমার এই ভাবটা কেটে গেল। এতদিন একসঙ্গে থাকার ফলেই বোধ হয় আমারও আর খারাপ লাগে না ওদের। স্বরঞ্জনও ওদের রীতিমত ভালবাসে।

স্বরঞ্জনের চাকরটি অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকে না। কটেজেরই একটা ঘরে ওকে থাকতে দেওয়া হয়। ভাল্লুকের সঙ্গে ষাঁড় এবং কুকুর মিশিয়ে ওকে তৈরী করা হয়েছিল। কেন জানি না, অন্য সব মানুষ-জন্তুগুলোর চেয়ে ওর আকৃতি অনেক বেশী মনুষ্যসুলভ।

স্বরঞ্জনের দেখছি একটা ভারী বদ্‌গুণ আছে। ভীষণ অ্যালকোহলের নেশা ওর। হাতে দিলে মেথিলেটেড স্পিরিটও ও খেয়ে ফেলবে। নেশা হয়ে গেলে ওকে সামলানো মুস্কিল।

যাই হোক পশু-মানুষদের এখন আমি প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখতে পারছি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোধ হয় চিরদিনই খাপ খাইয়ে নেয় মানুষ; না হলে যাদের আমি এই সেদিনও অপার্থিব ভাবছিলাম, তাদের আজ মোটেই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

আশেপাশে এদের দেখে মাঝে মাঝে নিজেকেই কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়।

তবে মাঝে মাঝে এদের পশুত্ব আমার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। হয়ত কোন পশুমানুষ নির্জনে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে আর তার শাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়েছে। এই ভঙ্গীটার মধ্যেই যেন কোথায় একটা পাশব ভাব নিহিত রয়েছে।

১০ই অক্টোবর ॥

আজ সকালবেলা স্বরঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম উষ্ণ ঝরণার উৎসের দিকে। যাবার সময় চাবুক আর রিভলবার নিতে ভুললাম না।

কিছুটা যেতেই একটা ঝোপের ওপাশ থেকে খরগোশের আর্তস্বর শুনতে পেলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। কিন্তু তারপরই সব চুপচাপ।

কেন জানি না, একটা খট্‌কা লাগল মনে। আর ঠিক সেই সময়েই কতগুলো অদ্ভুত ছোট ছোট জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সুরঞ্জন ছুটে গিয়ে একটাকে খপ করে ধরে ফেলল।

কাছে আনতে দেখলাম, পেছনের পাগুলো ওদের সামনের পায়ের চেয়ে অনেক বড়।

: 'পশু মানুষদের বাচ্চা', সুরঞ্জন ওটাকে ছেড়ে দিল।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমরা। একটা গাছের গায়ে দেখলাম নখের গভীর দাগ।

: 'ইস্, কী ভক্তি সাইনের ওপর', সুরঞ্জন বলল।

এরপরেই দেখা হল বাঁদর-মানুষ আর একটা ছাগল আর বাঁদরের সংমিশ্রণের সঙ্গে। শেষোক্ত প্রাণীটি বোধ হয় সান্যালের প্রথম দিককার সৃষ্টি।

দুজনেই সুরঞ্জনকে স্যালিউট করল। মুখে বলল: দ্বিতীয় চাবুকধারীর জয় হোক।

: চাবুক হাতে তৃতীয় একজনও এসেছেন, কাজেই সাবধান।

সুরঞ্জন ওদের হুঁসিয়ার করে দিল।

: 'তৃতীয় চাবুকধারী সমুদ্রের জলে নেমে গিয়েছিল।' ছাগল-বাঁদরের কণ্ঠে সংশয়।

সুরঞ্জন অবশ্য ওকে বলল: তাঁর একটা শক্ত চাবুক আছে।

: 'কাল ওর রক্ত বেরিয়েছিল' বাঁদর-মানুষ বলতে লাগল, 'আপনার কখনও রক্ত বেরয় না, 'তাঁর'ও রক্ত পড়ে না।'

: 'দূর হতভাগা', সুরঞ্জন বলল, 'ঠিকমত না চললে তোরও রক্ত বেরবে।'

: 'ওর পাঁচটা আঙুল আছে', বাঁদর-মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না, 'ও আমার মতই পাঁচ আঙুলে মানুষ।'

: 'চলুন সমীরণবাবু, এগোন যাক।' সুরঞ্জন আমায় বলল। আমরা হাঁটতে লাগলাম।

ফেরার পথেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল। এক জায়গায় দেখলাম একটা রক্তাক্ত খরগোশের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কেউ একটা খুবলে খেয়েছে

দেখলাম। মেরুদণ্ডটাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলেছে একেবারে। সুরঞ্জন আর আমি হতবাক।

: কী সর্বনাশ! সুরঞ্জনই প্রথমে বলল ; কে করল এমন কাজ!

: কোন মাংসাশী প্রাণী তার আগের অভ্যেস ফিরে পেয়েছে, আমি বললাম।

: 'অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ এটা'—বিড়বিড় করে ও বলল।

: 'এই দ্বীপে আসার প্রথম দিনে আমিও একটা এইরকম ব্যাপার দেখেছিলাম—'

: কি দেখেছিলেন আপনি?

: একটা খরগোশের দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন।

: আপনি যেদিন এলেন সেইদিন?

: হ্যাঁ সেইদিনই। কটেজের পেছনে যে জঙ্গলে-জায়গাটা আছে সেইখানে। অবশ্য কে সেদিন এইকাজ করেছিল তার একটা মোটামুটি ধারণা আমি করে নিয়েছি। মৃত খরগোশটা দেখতে পাওয়ার আগেই দেখি একটা পশু-মানুষ খালটার জলে মুখ ঠেকিয়ে জল খাচ্ছে।

: কে সে? তাকে চিনতে পারবেন এখন?

: নিশ্চয়ই।

: 'রক্তের স্বাদ'—সুরঞ্জন নিজের মনে বলে উঠল, তারপর পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে গুলিগুলো পরখ করে নিল। 'ওদের সকলেরই ত বদ্ধমূল ধারণা থাকা উচিত যে জীবিত প্রাণীর রক্ত মাংস খাবে না! কিন্তু কেউ যদি রক্তের স্বাদ কোন রকমে পেয়ে থাকে ত সর্বনাশ!'

আমরা দ্রুত ফিরতে লাগলাম।

: 'সেদিন আমি আর একটা বোকামী করেছি,' সুরঞ্জন যেতে যেতে বলল ; 'আমার চাকরটিকে খরগোশের ছাল ছাড়াতে শিখিয়ে দিয়েছি। ছাড়ান হয়ে যাবার পর দেখি সে তার রক্তমাখা হাত দুটো চাটছে। তখন এতটা ভেবে দেখিনি। চলুন ডঃ সান্যালকে গিয়ে জানাই।'

এই একটা মাত্র চিন্তাই আমাদের সারা পথ আচ্ছন্ন করে রাখল।

সব শুনে ডঃ সান্যাল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমারও ব্যাপারটা সুবিধের মনে হল না।

: 'এটা যে চিতা-মানুষের কাজ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ;' ডঃ সান্যাল

চিন্তিত মুখে বললেন ; 'অন্যদের ভয় দেখানোর জন্যে এক্ষুনি একটা কিছু করা প্রয়োজন। মাংস খাবার লোভটা যদি কোনরকমে সংবরণ করতে পারতাম আমরা। যাইহোক যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন চল বেরিয়ে পড়া যাক। একটা কিছু এই মুহূর্তে করা দরকার।'

ডঃ সান্যাল, স্বরঞ্জন আমি আর স্বরঞ্জনের চাকরটি সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের তিনজনের কাছে পিস্তল।

: এবার সব প্রাণীদের একত্র দেখতে পাবে, স্বরঞ্জন বলল। 'সে একটা দেখার জিনিষ।'

ডঃ সান্যাল সারা পথ গম্ভীর রইলেন। উষ্ণ জলের প্রস্রবণকে বাঁয়ে রেখে আমরা মোড় ফিরলাম। বেতবনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা খোলা জায়গা দেখতে পেলাম। তার মাঝখানে সেই গন্ধকের ঢিবি। সেটা পেরিয়েই সান্যাল তাঁর হাতের শিঙাটা বাজিয়ে দিলেন।

উঃ, জোর আছে বটে ঐ বৃদ্ধ ফুসফুসে! নিস্তব্ধ অরণ্যানীর শান্ত নীরবতা মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল ওই প্রবল শব্দে তীব্র একটানা স্বরে।

তারপরই আশেপাশে খস খস আওয়াজ শোনা গেল। দূরে কতগুলো অস্পষ্ট গলার স্বরও শুনতে পেলাম। একে একে সেই মানুষ-জন্তুর দল সামনের ফাঁকা জায়গাটায় জড় হতে লাগল।

ছাগল-বাঁদরকে চিনতে পারলাম। তারপর খড় চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এল একটা ঘোড়া-গণ্ডারের সংমিশ্রণ।

কাছে এসে সবাই মাথা নীচু করে সান্যালকে সম্মান জানাল। তাবপর তাদের নিয়মাবলীর শেষের দিকটা আবৃত্তি করতে লাগল :

যন্ত্রণাঘর ওই ওখানে ও ত তাঁরই
তৈরী করে তাঁরই হাত
আঘাত করে ওই দুহাত
আরামেরও হাত তাঁরই তাঁরই......

আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ গজ সামনে ওরা বসে পড়ল। তারপর দুহাতে ক'রে ধূলো নিয়ে নিজেদের মাথায় দিতে লাগল।

অভাবনীয় দৃশ্য! অপরাহ্নের সোনা-গলা রোদ ওদের ওপর পড়ে কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে সমগ্র পরিবেশটাকেই। কয়েকটা গাছের ফাঁক

দিয়ে আস্ফালনরত বিকেলের সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। গাছের ছায়াগুলো যেন গুঁড়ি মেরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

: 'বাষট্টি, তেষট্টি' সান্যাল গুনলেন ; 'বাকি চারজন কই?'

: চিতা-মানুষ নেই ; আমি জানালাম।

সান্যাল শিঙাটা আবার জোরে বাজালেন। একটা বেতবনের মধ্যে থেকে এবার চুপি চুপি বেরিয়ে এল চিতা-মানুষ। কেমন যেন একটা জড়সড় ভাব। তার কপালে তিনমাস আগেকার সেই আঘাতের চিহ্ন।

সবার শেষে বাঁদর-মানুষ এল।

: 'থাম!' প্রায় ধমকে উঠলেন ডঃ সান্যাল।

ওরা ধূলোয় লুটোপুটি করা বন্ধ করল।

: 'আইন বলে যাও' সান্যাল হুকুম করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে স্বর করে আরম্ভ করল :

চার পায়েতে হাঁটা নিষেধ, এই নিয়ম, আমরা মানুষ
মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ, এই নিয়ম, আমরা মানুষ।

: 'থাম!' সান্যাল আবার গর্জে উঠলেন ; 'আইন অমান্য করা হয়েছে।'

: 'কেউ রক্ষা পাবে না' ধূসর প্রাণীটা বলল।

আমার মনে হল প্রত্যেকেই জানে কি হয়েছে এবং কি ভীষণ শাস্তি অপেক্ষা করছে অপরাধীর জন্যে। ওদের পাশব মুখে ফুটে উঠেছে অসীম আতংকের ছাপ। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চারধারে তাকাচ্ছে ওরা।

: 'কেউ রক্ষা পাবে না' সমস্বরে বলে উঠল।

: 'কে এই নিয়ম ভেঙেছে?' রাগে ফেটে পড়লেন ডঃ সান্যাল। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে চাবুকের আওয়াজ করলেন সপাং করে।

হায়েনা-শুয়োর এবং চিতা-মানুষকেই একটু বেশী মনমরা মনে হল। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ডঃ সান্যাল চিতা-মানুষের দিকে চেয়ে রইলেন। ভয়ে সংকুচিত হয়ে প্রাণীটা কোন রকমে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণার স্মৃতি যেন তার মুখের ভাবে ফুটে উঠল।

গম্ভীর কণ্ঠে সান্যাল আবার বললেন : 'আমি জানতে চাই কে এই নিয়ম ভেঙেছে।'

: 'আইন যে মানে না, সে শয়তান' ধূসর প্রাণীটা বলে ফেলল।

তীব্র দৃষ্টিতে ডঃ সান্যাল চিতা-মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মনে হল তার ভেতরকার আত্মাকে পর্যন্ত আকর্ষণ করছে সে দৃষ্টি।

ওর দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন, 'যে আইন ভাঙে'—

: 'সে যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়, হে মহান্, সে যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়'—তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই পশু-মানুষের দল বলে উঠল।

: 'আবার যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়, আবার যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়।' বাঁদর-মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শাস্তিটা যেন তার মনের মতন হয়েছে।

: 'শুনলে ত?' চিতা-মানুষের দিকে তাকিয়ে সান্যাল বললেন।

আর ঠিক তারপরেই ঘটল সেই অভাবনীয় কাণ্ডটা। খাড়া হয়ে দাঁড়াল চিতা-মানুষ, আর তারপরেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ডঃ সান্যালের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কী নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে তার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব, তা না দেখলে বোঝানো যায় না।

বিস্ময়ে সবাই নির্বাক। আমি পিস্তল বার করলাম। চিতা-মানুষের আঘাতে সান্যাল ততক্ষণে গড়িয়ে পড়ছেন। কী বীভৎস চীৎকার মানুষ জন্তুগুলোর! মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি নরকের চিরকেলে বাসিন্দাগুলো হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসেছে।

আমি চিতা-মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছি, এমন সময় সে ডঃ সান্যালকে ছেড়ে দিয়ে পাশের একটা ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু। মাটি থেকে উঠেই ডঃ সান্যাল সেই ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। শূন্যে শুধু একটা শাদা ধোঁয়ার রেখা সৃষ্টি করে গেল গুলিটা। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-জন্তুর দল ধেয়ে গেল সেই দিকে। ডঃ সান্যাল আর স্বরঞ্জনের সঙ্গে আমিও তাদের পিছু নিলাম।

কিছুটা আসার পরে আমি একটু পিছিয়ে পড়লাম। সবার আগে দেখলাম ছুটছে স্বরঞ্জনের চাকরটি। তারপরই এক গাদা পশু-মানুষের সঙ্গে সান্যাল আর স্বরঞ্জন। ওদের দুজনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

হায়েনা-শুয়োরটা চলেছে ঠিক আমার পাশে পাশে আর থেকে থেকে আমার দিকে চোরা চাউনী হানছে।

ঝোপঝাড় ভেঙে প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে চিতা-মানুষ। প্রায় সিকি মাইল এইভাবে দৌড়নোর পর আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াল একটা ঘন বেতের ঝোপ। কাজেই আমাদের গতি কমে গেল। সাবধানে এগোতে লাগলাম আমরা।

ডালপালা লেগে সর্বাঙ্গ ছড়ে যেতে লাগল।

: 'এর মধ্যে দিয়ে ও চার হাতে পায়ে গেছে'—ডঃ সান্যালের কণ্ঠস্বর কানে এল।

কিছুটা আসার পরেই ঝোপটা শেষ হয়ে গেল। সামনেই দেখতে পেলাম চিতা-মানুষ ছুটে চলেছে। পেছন ফিরে আমাদের দেখে নিয়ে একটা টিলার ওপর উঠতে আরম্ভ করল।

তখনও তার দেহে মানুষের পোষাক রয়েছে, কিন্তু মুখে ফিরে এসেছে পুরণো পশুর ভাবটা। ওর ভঙ্গীটা অবিকল শিকারীর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া পশুর মত।

: 'কেউ রক্ষা পাবে না' নেকড়ে-ভাল্লুক চীৎকার করে উঠল। চোখে তার শিকার ধরার আনন্দ।

ততক্ষণে আমরাও টিলাটার তলায় এসে পৌচেছি। নেকড়ে-মানুষগুলো গর্জন করে উঠল।

সময় নষ্ট না করে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা। একেবারে ওপরে এসে দেখি চিতা-মানুষকে অন্য পশু-মানুষরা তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। চতুর্থ দিকে টিলাটা খাড়া হয়ে শ' দেড়েক ফুট নেমে গেছে। সেদিক দিয়ে পালাবারও কোন উপায় নেই।

প্রায় কুড়ি গজের ব্যবধান রেখে ডঃ সান্যাল বজ্রকঠিন স্বরে বললেন: এদিকে এস!

আমরা ভাবছি চিতা-মানুষ এই বুঝি তেড়ে আসে। কিন্তু সে সব সে কিছুই করল না। দু' একবার ডঃ সান্যালের চাবুকের আওয়াজের পর সে একটা অদ্ভুত শব্দ করে ঘুরে দাঁড়াল। আর তারপরেই দিল এক মরণ ঝাঁপ।

একটা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা আর্তনাদে দ্বীপটা একবার শিউরে উঠল, আর দেড়শ ফুট নিচে তার দেহটাকে চিনতে পারা গেল না।

বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে বসে নিরিবিলিতে একটু চিন্তা করার সুযোগ পেলাম। চোখের ওপর কেবলই ভেসে উঠতে লাগল চিতা-মানুষের চেহারাটা।

ডঃ সান্যালের নিষ্ঠুরতাকে একটা নতুন রূপে আমি দেখতে পেলাম। অপারেশনের সময়কার যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখেই আমি শিউরে উঠেছিলাম, কিন্তু এর পরেকার যন্ত্রণা আরও সাংঘাতিক।

মানুষ (?) হবার আগে ওদের ইচ্ছেগুলো পরাধীন ছিল না। ওরা পশু, পশুর মতই স্বাভাবিক জীবনযাপন করত। কিন্তু এখানকার জীবন ওদের ছোট বড় বাধা নিষেধের বেড়ায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। সর্বদা ভয়, এই বুঝি আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেল। তটস্থতার মধ্যে দিয়ে কেটে যায় সারা জীবন।

এতদিনে আমি পশু-মানুষদের অল্প অল্প ভয় যে না করতাম তা নয়। কিন্তু এখন সেই ভয়ের জায়গায় করুণা হতে লাগল।

১৭ই অক্টোবর ॥

আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে চিত-মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই সাতদিনের ঘটনাই এখানে লিখে রাখছি। এই কদিন আমরা এক নতুন দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সেদিন সারাদিন ছুটোছুটির ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিলাম রাত্রে। পরের দিন সকালে উঠে সবাই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম, কারণ পরীক্ষার জন্যে রাখা বেশ কয়েকটা খরগোশ খাঁচার মধ্যে থেকে অদৃশ্য। একটাকে ত কটেজের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে বোঝা গেল। রক্তের ফোঁটা পড়ে পড়ে মাটিটা কালচে হয়ে গেছে।

: 'কী সর্বনাশ!' ডঃ সান্যালের মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল।

রক্তের দাগকে আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। যে-ই নিয়ে যাক খরগোশগুলোকে, বেশ বোঝা গেল, পাচিল টপকে ঢুকেছিল। আবার সেই পথেই বেরিয়ে গেছে।

রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে আমরা কটেজ থেকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরে এসে একটা ঝোপের মধ্যে সবকটা খরগোশেরই ভুক্তাবশেষ দেখতে পেলাম। একটা মাংসাশী দানব যেন তার অপরিসীম জান্তব ক্ষুধা মিটিয়ে গেছে সেখানে।

সান্যাল এবং সুরঞ্জনের মুখ গম্ভীর। শেষে সান্যালই বললেন: 'চল দেখিগে, আজকের অপরাধীটি আবার কে। তার ভাগ্যে আজ অনেক কিছুই অপেক্ষা করে আছে।'

আগের দিনের মতই শিঙা বাজিয়ে পশু-মানুষদের ডাকা হল। সবাই

এল সেদিনের মতনই। নিয়মমত আইনও পড়ে গেল প্রত্যেকে, কিন্তু সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বাচাল বাঁদর-মানুষও চুপচাপ।

: 'কে আমার খরগোশ নিয়ে এসেছে কাল রাত্রে?' সান্যালের গলায় শরীর হিম করে দেওয়া ধমকের স্বর। 'বল, কে করেছে এই জঘন্য কাজ? কে অন্য প্রাণীর মাংস খেয়েছে! বল! উত্তর দাও!' একটু থেমে আবার বললেন, 'জবাব না পেলে সবাইকে আমি যন্ত্রণাঘরে পুরব।'

বিকৃতদেহ মানুষ-জন্তুদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। প্রত্যেকেই বলে উঠতে চাইল, আমি না! আমি না! ডঃ সান্যাল কিন্তু অপরাধীকে বার করতে স্থিরসংকল্প, কাজেই ক্রমাগত চাবুকের শব্দ হতে লাগল। সামনের শূন্য জায়গাটাকে খণ্ড খণ্ড করে দিল সান্যালের চাবুক। তবুও সবাই চুপ।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম হায়েনা-শুয়োরটাই দোষী। সান্যালকে বলতে গেলাম, কিন্তু আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন তিনি তার দিকে তাকালেন: 'কি শাস্তি জান ত?'

আভূমি নত হয়ে হায়েনা-শুয়োরটা বলল: 'জানি হে মহান্, আইন অমান্য করলে যন্ত্রণাঘরে ফিরে যেতে হয়। আমি নিয়ম মেনে চলি। নিয়ম আমি ভালবাসি।'

: 'তুমিই আইনভঙ্গকারী। তোমাকে আমি আড়ালে থেকে শাস্তি দেব।'

প্রচণ্ড ভয়ে হায়েনা-শুয়োরটা কাঁপতে লাগল। আমরা মুহূর্তের জন্যে ভাবলাম ও চিতা-মানুষের মত আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু সে সব ও কিছুই করল না। বোধ হয় 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' কথাটাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

সেদিন দুপুরে ঐ ব্যাপার নিয়েই কথা হচ্ছিল। স্বরঞ্জন বললে: ওর চাউনীটা আমার ভাল লাগেনি। মনে হয়, ওর মধ্যে প্রতিহিংসা জেগে উঠবে। আজ রাত্রেও হয়ত ও এখানে আসবে, তবে খরগোশ চুরি করতে নয়, সুবিধে পেলে আমাদেরই কাউকে ঘায়েল করতে।

: 'আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে,' ডঃ সান্যাল বললেন: 'কি করা যায় বল ত?'

: 'সুদর্শনকে কাজে লাগালে কেমন হয়?' স্বরঞ্জন জিজ্ঞেস করল।

: 'ঠিক বলেছ' ডঃ সান্যালের কথায় নিশ্চিন্ততার স্বর।

: 'সুদর্শন ! সুদর্শন কে ?' আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

: 'ওঃ হোঃ, আপনাকে বলা হয়নি, না ? আচ্ছা শুনুন', সুরঞ্জন আমার দিকে ফিরে বলল, 'সুদর্শন হচ্ছে ডঃ সান্যালের এক আশ্চর্য সৃষ্টি—'

: তার মানে ?

: সুদর্শনকে আপনি রোবো (Robot) এবং 'অ্যাণ্ড্রয়েড'র (Android— রাসায়নিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট কৃত্রিম মানুষ) এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলতে পারেন। অ্যাণ্ড্রয়েডের যেমন স্বাধীন চিন্তাশক্তি থাকে, সুদর্শনেরও তা নেই। এদিক দিয়ে ওর সঙ্গে একটা রোবোর কোন পার্থক্য নেই। আমরা যা চাই সেটা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে ওর নির্জীব মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সচল অবস্থায় প্রায় একশ গজের মধ্যে ও যে কোন জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব টের পায়। আমরা যদি ওর মাথায় এমন একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিই যে, আমরা তিনজন আর আমার চাকরটি ছাড়া রাত্রিবেলা অন্য কেউ কটেজে ঢুকলেই তাকে আটকানো দরকার, তাহলে সুদর্শন তা নিশ্চয়ই করবে এবং আমাদের জানিয়েও দেবে।

: 'তা আপনাদের এই সুদর্শনটি কোথায় ? দেখিনি ত কোনদিন।'

: 'ল্যাবরেটরীতে একটা কাঁচের কেসের মধ্যে আছে। প্রয়োজন হয়নি বলে ওকে বহুদিন বার করা হয়নি।'

: 'বেশ মজার ব্যাপার ত'—থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলাম।

তিনটে নাগাদ আমরা সুদর্শনকে বার করতে ল্যাবরেটরীতে গেলাম। এই ঘরটায় আগে কোনদিন আসিনি। বেশ বড় ঘর। নানারকম যন্ত্রে সাজান। সে সব যন্ত্র আগে কোনদিন দেখিনি।

ঘরের এক কোণে গিয়ে ডঃ সান্যাল একটা কালো পর্দা সরিয়ে দিলেন আর সুরঞ্জন একটা জোরালো আলো জ্বেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম, কারণ সামনে যা চোখে পড়ল তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিরাট লম্বা এক কাঁচের বাক্সে একটা স্বচ্ছ তরলের মধ্যে শুয়ে আছে প্রায় দশ ফুট দীর্ঘ এক মানুষের দেহ।

এ-ই তাহলে সুদর্শন !

সত্যিই সুদর্শন দেহ। যেন অস্বাভাবিক দীর্ঘ এক সুপুরুষ মানুষ ঘুমিয়ে আছে। কোন খুঁত নেই তার দৈহিক গঠনে।

: 'পশু থেকে এইরকম মানুষই আমি গড়তে চেয়েছিলাম, সমীরণবাবু,

কিন্তু আজও তা পারলাম না। তবে পারব, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পারব।' ডঃ সান্যাল আমার দিকে চেয়ে বললেন।

কাঁচের আধারটার ধারে শায়িত দেহের মাথার দিকে এক অদ্ভুত যন্ত্রের একটা লিভারের ওপর ডঃ সান্যাল হাত রাখলেন। অন্য হাতে মাথায় একটা বিচিত্র টুপি পরে নিলেন। ওই টুপি থেকে অসংখ্য সূক্ষ্ম তার বেরিয়ে ওই বড় যন্ত্রটায় মিশেছে।

লিভারটা সামনের দিকে টানলেন ডঃ সান্যাল। বড় আলোটা স্বরঞ্জন নিভিয়ে দিল।

বড় যন্ত্রটার মধ্যে থেকে একটা নীলচে আলো ক্রমশ ফুটে বেরোতে লাগল। তারপর সেটা কেন্দ্রীভূত হতে লাগল সুদর্শনের মাথায়।

সবাই চুপচাপ। ডঃ সান্যাল ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছেন। এদিকে মিনিট পাঁচেক বাদে নীল আলোটা ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেল। আরও খানিক বাদে তা গাঢ় লাল রঙে দাঁড়াল।

আমার একবার মনে হল, শুয়ে থাকা রোবোটার একটা হাত বুঝি নড়ে উঠল।

স্বরঞ্জন আবার জোরালো আলোটা জ্বেলে দিল। তারপর কাঁচের বাক্সটার গায়ে একটা স্টপকক্ খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরকার তরল পদার্থটা কাঁচের টিউবের মধ্যে দিয়ে একটা বড় পাত্রে ভর্তি হতে লাগল।

সবটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে স্বরঞ্জন একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ মুছে দিল। তারপর জোরালো আলোটা আবার নিভিয়ে দেওয়া হল।

খুট্। সান্যাল একটা স্বইচ টিপলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র সবুজ আলো এসে সুদর্শনের মাথায় পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদেই রোবোটার বুকে স্পন্দন লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে ও চোখ মেলল। আবার তখুনি বন্ধ করে ফেলল। খানিকবাদে আবার চেয়ে দেখল। যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙার ফলে কোথায় আছে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

সবুজ আলোটা এবার হলদে হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ও ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মতন চমকে উঠল। সর্বাঙ্গে চাঞ্চল্য। উঠে বসল ও।

স্বরঞ্জন তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল: 'সুদর্শন প্রস্তুত।'

বিকেলে চা খাওয়ার পরে ডঃ সান্যাল বললেন : যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমরা ক'জনে ছাড়া যে-ই এখানে আসুক না কেন, সুদর্শন তাকে ধরে ফেলবে।'

: আচ্ছা, ওর মাথায় আপনাদের চিন্তাগুলো কি ভাবে পাঠালেন বলুন ত ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ; সুরঞ্জন বলল ; 'তবে অনেকটা থট্ প্রোজেকশনের মত। আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব।'

সন্ধ্যেটা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। পুমাটার বিশ্রাম, কাজেই ডঃ সান্যালও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

রাত্রে সব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দরজা জানালাগুলো ভালো করে এঁটে রাখতে ভুললাম না।

সে রাত্রে ভাল ঘুম হল না, মাঝে মাঝেই ভেঙে যেতে লাগল। বাইরে সুদর্শনের পায়ের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। পাহারা দিচ্ছে ও।

পরপর ক'রাত্রিই উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। সুদর্শনকে শেষে একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল।

পঞ্চম রাত্রে আমার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল কিসের একটা আওয়াজে। মনে হল কেউ যেন আমার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি ঠিক মত বন্ধ আছে পাল্লাগুলো। ঠিক সেই সময়ে আবার বাইরে আওয়াজ। কে যেন পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছে।

একটা ভীষণ কৌতূহল আমার ওপর ভর করল। কে এসেছিল দেখতে হবে। ঘরের খিলটাকেই অস্ত্র হিসেবে খুলে নিয়ে সন্তর্পণে বাইরে উঁকি মারলাম কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

যে দিকে শব্দটা সরে গেছে মনে হল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম আমি। আস্তে আস্তে কটেজের পেছন দিককার উঠোনের মাঝখানে এসে পৌছলাম।

আকাশে দ্বাদশী না ত্রয়োদশীর চাঁদ চারদিক বেশ আলো করে তুলেছে।

আবার সেই শব্দ! এক মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালাম, আপনা হতেই হাতের আঙুলগুলো খিলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আর তখনই একটা অজানিত আশংকা আমাকে কাবু করে ফেলল।

খস্ খস্। এবার অন্যদিক থেকে এল শব্দটা। সেদিকে ভাল করে তাকাবার আগেই একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। আমি ছিটকে পড়লাম। হাত থেকে খিলটা বেরিয়ে গেল। *

তারপরেই আমার ওপর চেপে বসল সেই কালো জীবটা। চোখ দুটো তার আগুনের ভাঁটার মত। বীভৎস হাঁ-করা মুখটা থেকে জিভটা লক্ লক্ করে বেরিয়ে এসেছে। চাঁদের আলোয় পাশব দাঁতগুলো ওর ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

আমার গলার কাছে ও মুখটা নামিয়ে আনতে চেষ্টা করছে আর আমিও প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ওই জান্তব শক্তির কাছে আমার ক্ষমতা প্রতি মুহূর্তে পরাজিত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। বেশীক্ষণ এইভাবে আটকাতে পারব কি ?

আমার যখন এই অবস্থা, ঠিক তখনই একটা হুড়মুড় করে আওয়াজ হল। একটা দীর্ঘাকৃতি প্রাণীর আবছা মূর্তি ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলাম। আর তার পরেই আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান হল যখন, দেখলাম নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, ভোরের আলো জানলা দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার আগের রাত্রির ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপরেই চোখে পড়ল সুরঞ্জন বসে আছে চেয়ারে। আমি চোখ খুলতেই ও বলে উঠল : 'কি ? কেমন আছেন এখন ? খুব খেলা দেখালেন যা হোক !'

: 'আচ্ছা, কাল রাত্রে কে আমাকে আক্রমণ করে বসল বলুন ত ? আর তার হাত থেকে আমি বাঁচলামই বা কি করে ?'

: কালকে যার পদধূলি পড়েছিল কটেজে, সে হল নেকড়ে-মানুষ—

: নেকড়ে মানুষ ? আমি ত ভেবেছিলাম হায়েনা শুয়োর—

: না, তা নয়, আমরা ভুল করেছিলাম। যাই হোক, ওকে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে। আর আপনাকে বাঁচিয়েছে কিন্তু সুদর্শন।

: তাই নাকি ?

: হ্যাঁ। সুদর্শনকেও ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম, ভাগ্যিস ওকে কেসের মধ্যে রাখা হয়নি। নেকড়ে-মানুষের আসাটা ও টের পেয়েছিল। কিন্তু ও ত নিজেই ঘরে বন্দী। গোড়ায় চেষ্টা করেছিল দরজাটা কোনরকমে খুলে ফেলতে। শেষে তা না পেরে দরজা ভেঙেই বেরিয়ে এসেছিল। এই সব কারণেই ওর একটু দেরী হয়ে যায়। দরজা ভাঙার আওয়াজে আমার ঘুম

ভেঙে যায়। আমি এসে দেখি নেকড়ে-মানুষটাকে আপনার ওপর থেকে ঘাড় ধরে সরিয়ে দিচ্ছে সুদর্শন।

একটা ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম বটে। কতবার যে মৃত্যুকে ফাঁকি দিলাম, তার হিসেব রাখা মুস্কিল।

২০শে জানুয়ারী ॥

নেকড়ে-মানুষ ধরা পড়ার পর আরও তিনমাস কেটে গেছে। তাকে ডঃ সান্যাল যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা অবর্ণনীয়।

এতে অবশ্য লাভ হয়েছিল কিছুটা, পশু-মানুষের হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করেছিল।

ভীষণ একঘেয়ে আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। সান্যালের এই গবেষণার ওপর আমাব বিতৃষ্ণা এসে গেছে। মানুষের এই লোক-হাসানো অনুকরণ আমার মনে হয় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন।

এখন আমার একমাত্র চিন্তা কি করে এই অভিশপ্ত দ্বীপের বীভৎস অধিবাসীদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। দেশের কথা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের কথা রোজই মনে পড়ে।

বেশীর ভাগ সময়ই এখন আমি সমুদ্রের ধারে কাটাই—যদি কোন জাহাজের দেখা পাই সেই আশায়, কিন্তু জাহাজ আর আসে না।

এমনি সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটল যার ফলে আমাদের ভাগ্য এক ভিন্ন পথে চালিত হল।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কটেজের সামনে পায়চারী করছিলাম। তিনজন পশু-মানুষ শব বয়ে আনছিল। তখন সকাল ছ'টা হবে। সান্যাল বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন। আমায় দেখে একটু হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্যবচ্ছেদ ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। ডঃ সান্যাল আজকের কাজ আরম্ভ করতে ঢুকলেন। পুমাটার ওপরই এখন পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিকট চিৎকার শুরু হল।

বুঝলাম, আবার তার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এখন আর এই আর্তনাদ আমাকে বিচলিত করে না। এ ক'মাসে সবকিছু হয়ে গেছে।

এর ঠিক পরেই ঘটনাটা ঘটল। কি যে হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। পেছন দিকে খালি একটা কর্কশ চীৎকার শুনতে পেলাম, আর তারপরেই সেদিকে ফিরে দেখি একটা অমানুষিক ভীষণ মূর্তি আমার দিকে ধেয়ে আসছে। তার মুখ মানুষের নয়। পশুরও সে রকম মুখ আমি কোনদিন দেখিনি। নরক থেকে যেন অকস্মাৎ ছিটকে এসেছে সে। কুৎসিত মুখে অসংখ্য কাটা আর তার ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠছে। হলদেটে রঙ, দু'চোখের পাতার কোন অস্তিত্ব নেই আর চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা।

কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে ছিলাম আমি, তারপরেই তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাকে ফেলে দিয়ে সে তার পথ করে নিল। সেই সঙ্গে হাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম হাতটা ভেঙে গেছে। উঠে বসার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নেই।

এমনি সময়ে ডঃ সান্যাল বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলবার। সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমায় দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন :— সমীরণবাবু, সমীরণবাবু, দেখেছেন পুমাটা কোনদিকে গেল ?

ও ওটা তাহলে সেই পুমাটা। আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম সে কোন্‌দিকে গেছে।

খানিকবাদে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। দূরে সমুদ্র তীরের একটা অংশ চোখে পড়ল, দেখলাম অসম্পূর্ণ পুমা মানুষটার পেছনে ডঃ সান্যাল ছুটে চলেছেন। দুবার তিনি গুলি ছুঁড়লেন কিন্তু দুইবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট। প্রতি পদক্ষেপে পুমাটা অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক সময় ওরা হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

হাতটায় ভীষণ ব্যথা। কোন রকমে উঠে দাঁড়ালাম। কটেজের মধ্যে ঢুকতেই সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা। ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমায় দেখে বলে উঠল :—জানেন সমীরণবাবু পুমাটা, শেকল ছিঁড়ে পালিয়েছে। আমার হাতের দিকে তার নজর পড়ল : কী সর্বনাশ ! আপনার হাতে কি হল ?

: 'দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম' অতি কষ্টে উত্তর দিলাম।

: 'আপনার জামায় রক্ত' আমার হাতটা পরীক্ষা করল ও, 'আপনার

হাত ত দেখছি ভেঙে গেছে। অবশ্য কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার নয়।' সংক্ষেপে সব বললাম ওকে।

: ভয় নেই, কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যাবেন আপনি। হাতটা ব্যাণ্ডেজ করতে করতে ও বলল।

তারপর একটা পিস্তল হাতে স্বরঞ্জনও বেরিয়ে পড়ল। হাতটা নিয়ে এবার বেশ মুস্কিলে পড়লাম। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, যে সব বিপদ আমি কাটিয়ে এসেছি তার কাছে এ ত কিছুই না।

চেয়ারে বসে পড়ে আমি অভিশপ্ত দ্বীপটার অভিশাপের বোঝা আরো কিছু বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে স্বরঞ্জন ফিরে এল : 'ডঃ সান্যালের কোন খোঁজ পেলাম না' ও বলল ; 'কয়েকটা বাড়তি গুলি নিয়ে আবার গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখি। আপনি বরঞ্চ এই রিভলবারটা কাছে রেখে দিন যদি প্রয়োজন হয়।

ও বেরিয়ে গেল, কেবল জায়গাটায় রেখে গেল ওর উদ্বেগের এক অংশ। বেশীক্ষণ আর বসে থাকতে পারলাম না। রিভলবারটা নিয়ে কটেজের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নিস্তব্ধ আতংকিত সকাল। বাতাস যেন হঠাৎ থমকে থেমে গেছে। দূরে সমুদ্রটাকেও শান্ত দেখাচ্ছে। চারিদিকের শব্দহীনতার একমাত্র প্রতিবাদ করে চলেছে নাম-না-জানা একটা পাখির একটানা ডাক।

আমি স্থির থাকতে না পেরে পায়চারী করতে লাগলাম। বহুদূরে স্বরঞ্জনের গলা শুনতে পেলাম। সান্যালকে ডাকছে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। বোধ হয় জ্বর এসেছে। আমার ছায়াটা ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। বেলা বাড়ছে এখন। সমুদ্রের ধারে কয়েকটা পশু-মানুষ দেখলাম জটলা করছে—

—কি ব্যাপার! ওরা কি আর ফিরবে না নাকি!

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল চারদিকে একটা অসহ্য অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম পিস্তলের আওয়াজে। পর পর বেশ কয়েকটা শব্দ। বিপদের আশংকায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার গর্জন করে উঠল একটা পিস্তল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বীভৎস চিৎকারে আমার দেহের প্রতিটি লোম খাড়া

হয়ে উঠল। অমঙ্গলের একটা ছায়া যেন সমস্ত দ্বীপটার ওপর নেমে এসেছে।

আবার পিস্তলের শব্দ। তবে এবার খুব কাছে। শব্দ লক্ষ্য করে খানিকটা যেতেই দেখি সুরঞ্জন। কিন্তু একী অবস্থা হয়েছে ওর! উস্কখুস্ক চুল, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করল: --'ডঃ সান্যাল ফিরেছেন?'

: 'কই, না, ত।'

: 'সে কী! শিগ্‌গির চলুন ভেতরে যাই, ওরা সবাই ক্ষেপে গেছে। পাগলের মত সব ছুটে বেড়াচ্ছে চারিদিকে।'

ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। শেষকালে যা ভেবেছিলাম তাই হল! ওরা বিদ্রোহ করল!

আমার চেয়ারটাতে বসে পড়ে সুরঞ্জন হাঁপাতে লাগল। ওর চাকরটা তখনও ক্ষেপেনি। সে-ও মাটিতে বসে পড়ল। আমিও আর একটা চেয়ার টেনে নিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সুরঞ্জন বলতে লাগল: —'ডঃ সান্যাল যে দিকে গিয়েছিলেন সেই পথে আমি কিছুটা গেলাম। যেতে বিশেষ অসুবিধে হল না, কারণ পুমাটার ব্যাণ্ডেজের কাপড় এদিকে ওদিকে পড়েছিল। সেই দেখেই এগোতে লাগলাম আমি।

'খালটা পেরিয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আর কোন চিহ্ন পেলাম না। এদিক ওদিক অনেকক্ষণ খুঁজলাম সান্যালকে, তাঁর নাম ধরে চীৎকার করে কিন্তু কোন সাড়া নেই।

'এক জায়গায় কতগুলো পশু-মানুষ গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিল, তাদের ডাকলাম, কিন্তু তারা পালিয়ে গেল। তারপর ওদের আস্তানায় গেলাম, সেখানেও কেউ নেই।

'তখন একটা অজানা ভয়ে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম, তার পরেই ফেরার পথ ধরলাম।

'কিছুটা আসতেই দুটো পশু-মানুষ আমার সামনে পড়ল, ওদের মুখে রক্ত। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কি সব বলাবলি করছিল, আমায় দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। তার পরেই দুজন আমার দিকে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে একটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলাম, আর একটার লাগল বুকে।

'ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমিও রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম, কাজেই আর সময় নষ্ট না করে কটেজে ফিরে এলাম।'

: 'এ সবের মানে কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

স্বরঞ্জনের হাত নাড়াতে হতাশ ফুটে উঠল। ব্র্যাণ্ডির বোতল টেনে নিল ও।

কিছুক্ষণ পরে আমি লক্ষ্য করলাম স্বরঞ্জন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম: 'শুনুন, ডঃ সান্যাল নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন, চলুন আমরা আরও ভাল করে খুঁজে দেখি'।

দু একবার মৃদু আপত্তি করে স্বরঞ্জন রাজী হল।

· · সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রাহরিক অভিযান সত্যিই মনে করে রাখার মতন।

সবার আগে চলল স্বরঞ্জনের ভৃত্য। তার হাতে একটা কুড়ুল। ওর ঠিক পেছনেই স্বরঞ্জন। ক্লান্ত দেহ কোন মতে টেনে টেনে চলেছে। ব্র্যাণ্ডি থেকে উঠিয়ে আনার জন্যে একটু হয়ত বিরক্ত।

আমি চলেছি সবার পেছনে। বাঁ হাতটা শ্লিংএ ঝোলান। ডান হাতে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরেছি।

হঠাৎ স্বরঞ্জনের চাকরটি থেমে গেল। আমরাও সেই সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর তার পরেই শুনতে পেলাম কারা যেন সব কথা বলতে বলতে আসছে।

: 'তিনি মৃত'- একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

: 'না, না তিনি মারা যাননি'--আরেকজন বলল।

: 'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি'-- অনেকে বলে উঠল।

স্বরঞ্জন ওদের দেখেই চিৎকার করে বলল: 'এই, এই শোন। এদিকে শুনে যাও।'

আমি রিভলবার শক্ত করে ধরলাম।

খানিকক্ষণ সব চুপ। তার পরেই ঝোপঝাড় ভেঙে পাঁচ, ছ'টা পশু-মানুষ এসে হাজির। উত্তেজনায় ওদের চোখগুলো যেন জ্বলছে।

বাঁদর-মানুষ, আইনরক্ষক সেই ধূসর প্রাণীটা আর দুজনকে আমি চিনতে পারলাম। বাকি দুজনকে বোধ হয় আগে দেখিনি।

ধূসর প্রাণীটার শাদা চুল মাথার দুপাশে ঝুলে পড়েছে। দুটো ডালের ফাঁক থেকে কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দেখছে।

কিছু সময় চুপচাপ কেটে গেল। তারপর একটু কেসে স্বরঞ্জন বলল: কে বলেছে তিনি মারা গেছেন?

বাঁদর-মানুষ চট করে বলল: সবাই দেখেছে।

: 'কোথায় তিনি?' স্বরঞ্জন প্রশ্ন করল।

: 'ওই দিকে' আঙুল দেখাল ধূসর প্রাণীটা।

: এখনও কি এটা নয় ওটা নয়! জিজ্ঞেস করল বাঁদর-মানুষ—এখনও কি নিয়ম মেনে চলতে হবে? তিনি কি সত্যিই মারা যাননি?

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: এখনও কি আইন আছে?

: 'এখনও কি আইন আছে দ্বিতীয় চাবুকধারী?' বাঁদর-মানুষ জানতে চাইল; 'তিনি ত মারা গেছেন।'

আমার দিকে চেয়ে স্বরঞ্জন ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল: 'ডঃ সান্যাল তাহলে সত্যি সত্যিই মারা গেছেন।'

এতক্ষণ আমি ওর পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এবার পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এগিয়ে এলাম। চিৎকার করলাম: 'শোন, তোমরা সবাই শোন। তিনি মারা যাননি।' আমার দিকে সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল; তিনি শুধু তাঁর পুরণো দেহটা ত্যাগ করেছেন। কিছুদিন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না। তিনি এখন আকাশে। তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু তিনি সবই দেখছেন। কাজেই প্রত্যেকে নিয়ম মেনে চল।'

ওরা সবাই আকাশের দিকে তাকাল। বাঁদর-মানুষ কেমন যেন ভয় ভয় গলায় বলল: তিনি ভাল, তিনি মহৎ, তিনি অমর।

: 'যার পেছনে তিনি ছুটছিলেন, সে কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

: চিৎকার করতে করতে সে ছুটছিল। তার সারা শরীর থেকে রক্ত পড়ছিল। সে-ও মারা গেছে। ধূসর প্রাণীটা আস্তে আস্তে বলল।

: 'বেশ হয়েছে', স্বরঞ্জন মুখ বিকৃত করল।

: 'আচ্ছা, এবার আমায় দেখিয়ে দাও ত কোথায় তাঁর পুরণো দেহটা পড়ে রয়েছে।' আমি বললাম।

: এই দিকে আসুন, সমুদ্রে নেমে-যাওয়া মানুষ। ধূসর প্রাণীটা আমায় ডাকল। ওকে অনুসরণ করে আমরা এগোতে লাগলাম।

এমন সময় হঠাৎ একটা মর্মভেদী আর্তনাদ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাশ কাটিয়ে একটা পশু-মানুষের বাচ্চা পালিয়ে গেল। তারপরেই

দেখলাম একটা দানবাকৃতি পশু-মানুষ তেড়ে আসছে। তার সর্বাঙ্গে রক্ত লেগে।

আমাদের দেখে থেমে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে কিন্তু গতি সামলাতে না পেরে একেবারে সামনে এসে পড়ল।

ধূসর প্রাণীটা ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে দাঁড়াল। আর সুরঞ্জনের ভৃত্যটি লাফিয়ে পড়ল রক্তমাখা প্রাণীটার ওপর। কিন্তু সে এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। একটা গুলি ব্যর্থ হতেই সুরঞ্জনও পিছু হটতে লাগল।

আমি গুলি করলাম, কিন্তু তবুও সে থামল না। এবার আমার দিকে তেড়ে আসতে লাগল। আবার গুলি করলাম, এবার মুখে। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তেড়ে এল। আমায় ছেড়ে দিয়ে সুরঞ্জনকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ল।

এদিকে অন্য পশু-মানুষরা সবাই পালিয়ে গেছে। সুরঞ্জন মৃত প্রাণীটার কবল থেকে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

খানিক পরে পশু-মানুষেরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম: 'নিয়ম মেনে না চললে এই অবস্থাই হয়।'

: 'বজ্র হানে তাঁরই হাত', ওরা কয়েকজন বলে উঠল।

বাকি সকলে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল।

দ্বীপটার পশ্চিমপ্রান্তে এসে পুমাটার মৃতদেহ আবিষ্কার করলাম। গুলি লেগে তার কাঁধটা ভেঙে গেছে। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। কেউ যেন অবিরাম চিবিয়েছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

প্রায় কুড়ি গজ দূরে, একটা ঝোপের ধারে ডঃ সান্যালের মৃতদেহটাও পাওয়া গেল। ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছড়ানো চারদিকে। একটা হাত কব্জির কাছ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মাথায় একটা ভীষণ আঘাতের চিহ্ন। চারপাশে চাপ চাপ রক্ত।

ধীরে ধীরে সুরঞ্জন তাঁর দেহটা চিৎ করে দিল। ছ'সাতজন পশু-মানুষকে দিয়ে মৃতদেহ কটেজের মধ্যে নিয়ে আসা হল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। থেকে থেকে পশু-মানুষদের বিকট চিৎকার কানে আসছে। কটেজে আছি শুধু সুরঞ্জন আর আমি।

হঠাৎ ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই কানে এল একের পর

গুলির আওয়াজ। ছুটে গিয়ে দেখি পরীক্ষার জন্যে রাখা জীবজন্তুগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলেছে সুরঞ্জন।

আমরা দুজনে এসে আমার ঘরটাতে বসলাম। দুজনেই চুপচাপ। একই সঙ্গে বোধহয় এই নতুন পরিস্থিতির কথা ভাবছিলাম আমরা।

ডঃ সান্যালের ব্যক্তিত্ব সুরঞ্জনকে অদ্ভুতভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ও যেন কোনদিন চিন্তাই করে উঠতে পারেনি তাঁর মৃত্যু সম্ভব। গত দশ বছর এই দ্বীপের থেকে যে সব অভ্যাস তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, এই দুর্ঘটনা সেগুলোকে আমূল উপড়ে ফেলল।

সুরঞ্জন যখন কথা বলতে আরম্ভ করল, যেন এলোমেলো মনে হতে লাগল সেগুলো: একটা অস্বাভাবিক জীবন এতদিন আমায় আঁকড়ে ছিল। সত্যিকারে বেঁচে থাকা কাকে বলে, এখন প্রায় ভুলেই গেছি। জানি না, কবে আমার প্রকৃত জীবনের শুরু।

প্রথম ষোলটা বছর কেটেছে স্কুলের বোর্ডিং-এ অসংখ্য বাধানিষেধের মধ্যে। তারপর ছটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি মেডিক্যাল কলেজের দেওয়াল-গুলোর মধ্যে। তারপর একদিন ঘটল মতিবিভ্রম, যার ফলে গত দশ বছর এই দ্বীপে কাটাতে হল।

বলতে পারেন সমীরণবাবু, ভবিষ্যৎ আমাকে আর কি দেবে? ও থামল।

এ' কথার কোন উত্তর নেই বলে আমিও চুপ করে রইলাম। তারপরে বললাম: 'এখন কিন্তু আমাদের চিন্তা করা উচিত, কি করে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া যায়।'

: কি হবে এখান থেকে গিয়ে? কোথায় যাব আমি? যখন আসি তখনই বিশেষ আত্মীয়স্বজন ছিল না; আর এই দশ বছরে সে আত্মীয়তাও চিড় খেয়ে গেছে। আর ঝালানো সম্ভব নয় তাকে। মিসফিট, সভ্যজগতের একটা মিসফিট আমি।

: 'বেচারা ডঃ সান্যাল! কাল একটা সদ্গতি করতে হবে তাঁর। আর তাছাড়াও আমরা যদি চলে যাই, ভালো পশু-মানুষগুলোকে কে দেখবে?'

: 'সে সব কাল ভাবা যাবে এখন।'

আমার কথা যেন ও শুনতেই পেল না, নিজের মনেই বলে চলল: ওদের মধ্যে যারা মাংসাশী ছিল তাদের পরিণতি ভয়ংকর হবে। সকলকেই মেরে

ফেল। উচিত কিন্তু তা আমরা পারব কি? কিছুদিনের মধ্যেই ত ওরা আবার সেই আগেকার পশুতে রূপান্তরিত হবে।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে ও নানান্ কথা বলে চলল। শেষে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

ও তখন পাশের ঘর থেকে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। আমার দিকে চেয়ে বলল: 'আসুন, সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী মানুষ, একটু হুইস্কি ছুঁয়ে দেখুন, শান্তি পাবেন।'

: 'না, ধন্যবাদ'—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম।

মোমবাতির আলোয় দেখতে পেলাম, ও একটা বোতলের প্রায় অর্ধেক শেষ করে ফেলল। একটু বাদেই নেশা হতে আরম্ভ করল। যা তা বকতে লাগল ও। বিরক্ত হয়ে আমি অন্যদিকে মুখ ফেরালাম।

নেশার ঘোরে ও কান্নাকাটি আরম্ভ করল পশু-মানুষদের জন্যে। ওরাই নাকি একমাত্র ওর মঙ্গল চিন্তা করে।

হঠাৎ ওর মাথায় কি একটা ফন্দী এল, সব কিছুকে চুলোয় পাঠিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর টলতে টলতে দরজার দিকে এগোতে লাগল।

আমি ওর পথ আটকে বললাম: 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি, ওই পশু-মানুষগুলোকে মদ খাওয়াবেন নাকি!'

: 'পশু!' ও বলে উঠল; 'পশু ত আপনি। ওরা সবাই মানুষ, ভদ্রলোকের মতই মদ খাবে ওরা।'

: 'দোহাই আপনার, এমন কাজ করবেন না।'

: 'সরুন, পথ ছাড়ুন!' পকেট থেকে ও রিভলবার বার করল। অগত্যা আমি সরে দাঁড়ালাম। ও রিভলবারটা পকেটে পুরতেই ইচ্ছে হল পেছন দিক থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু ভাঙা হাতটার কথা ভেবে আর ভরসা হল না। মুখে বললাম: 'যান, পশুদের সঙ্গে আপনাকে মানাবে ভাল।'

এক হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে সুরঞ্জন আমার দিকে মুখ ফেরাল: 'আপনার যেমন দেমাক তেমনি একটা আস্তা পাঠা আপনি'—ও জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল; 'ভয় পেতেই যেন আপনার জন্ম। আরে, আমরাও নরকের গেটের সামনেই পৌঁছে গেছি, এখন শুধু খুলে যাওয়ার অপেক্ষা। কালই হয়ত দেখবেন গলায় দাঁতের দাগ নিয়ে আমি মরে পড়ে আছি।'

'আজ আমার ছুটি, আর তা আমি ভালভাবেই উপভোগ করব।' এই বলে ও বেরিয়ে গেল।

ওর অপস্রিয়মান দেহটাকে বাইরের জমাট-বাঁধা অন্ধকারটা গ্রাস করে ফেলল। আমি ভাল করে দরজা এঁটে দিলাম।

এখন আমি সম্পূর্ণ একলা। ডঃ সান্যালও মৃত আর সুরঞ্জনকেও কি অবস্থায় পাব জানি না।

জানলার ধারে এসে দাঁড়ালাম। রুপোলী চাঁদের আলোয় তিনটে আবছা মূর্তিকে সমুদ্রের দিক থেকে আসতে দেখলাম। সুরঞ্জনের গলা কানে এল। চেঁচিয়ে ওদের ডাকছে: 'খা খা, ওরে জানোয়ারের দল, মদ খা তোরা, খেয়ে মানুষ হ।' ও চিৎকার করে বলতে লাগল: 'না', আমারই দেখছি জিৎ, সান্যালের মাথায় ত এ বুদ্ধি আসেনি' এই বলে সবাইকে কিছুটা হুইস্কি খাইয়ে দিল ও। তারপর আবার ওর গলা কানে এল 'গান কর সবাই গান কর, বল, নরকের মত সুন্দর জায়গা নেই, বল, সমীরণবাবু নিপাত যাক।'

প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বরে চেঁচাতে লাগল। তারপর সবাই মিলে সমুদ্রের দিকে এগোতে আরম্ভ করল।

এতক্ষণে রাত্রি তার স্তব্ধতা ফিরে পেল। চাঁদের আলোয় চারিদিকে আলোকিত। দূরে চিক চিক করে উঠছে কালো সমুদ্রের জল। ঘরের মধ্যে জ্বলছে শুধু একটা মোমবাতি।

জানলাটা ভাল করে বন্ধ করে দিলাম।

ফিরে দাঁড়াতেই ভেতর দিকে ডঃ সান্যালের মৃতদেহ চোখে পড়ল। সে দরজাটাও বন্ধ করে দিলাম। তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম আমার চোখে আসবে না ঠিক করেছিল বোধহয়। কাজেই শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম আমার কর্তব্য।

ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে গিয়ে ঠিক করলাম, ভোর হলেই আমার লাইফবোটে কয়েকটা জিনিষপত্র তুলে ফেলে ভেসে পড়ব; তারপর যা হবার তা হবে। এই দ্বীপে না খেতে পেয়ে অথবা এই বিকৃত মানুষ-জন্তুর হাতে মারা পড়ার চেয়ে জলে ডুবে মরাও অনেক ভাল।

তবে যাবার আগে ডঃ সান্যালের সৎকার করে যাব। সুরঞ্জনের জন্যে

দুঃখ হল। বেচারার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর অবস্থা অনেকটা পশু-মানুষদের মতনই। সভ্য সমাজে ওর আর জায়গা নেই।

নানান্ চিন্তায় কেটে যাচ্ছিল আমার বিনিদ্র রাত্রি, এমন সময়ে স্বরঞ্জনের কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাস্রোত বাধা পেল। নেশার ঘোরে চিৎকার করে প্রলাপ বকে চলেছে ও কাছেই কোথায়। অনেকগুলো পশু-মানুষের গলার স্বর কানে এল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা যেন চেঁচাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে কাঠ কাটার শব্দ শুনতে পেলাম তারপর আবার সেই সংগীত।

আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারলাম না, সকালে দ্বীপ ত্যাগের তোড়জোড় আরম্ভ করে দিলাম।

কয়েকটা বিস্কুটের টিন সংগ্রহ করলাম। ভেতরের বিস্কুটগুলো দেখলাম ভালই রয়েছে। প্রতি বছরে একবার করে স্বরঞ্জন আন্দামান থেকে এই সব নিয়ে আসত।

আমি গোছাতে লাগলাম। সকাল বেলাতেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব।

এক হাতে করতে হচ্ছিল বলে বেশ সময় লাগল। শেষে একসময় পূর্বদিকটা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করল। তারপর ক্রমশ দিনের আলো ফুটে উঠল।

দূরে একটা কোলাহল কানে আসছিল, মনে হচ্ছিল, সবাই যেন একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে: দাও, দাও, আরও দাও।

তারপরেই একটা তীব্র বিকট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা পিস্তলের শব্দ কানে এল।

গুলিভরা পিস্তলটা নিয়ে আমি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। দরজার কাছে একটা চাবুক পড়েছিল, সেটাও তুলে নিলাম।

পরিষ্কার শুনতে পেলাম স্বরঞ্জন আমার নাম ধরে ডাকছে। সমুদ্রতীরে আমার নৌকোর কাছে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ভোরের আকাশে আস্ফালন করছে তার লাল শিখা!

স্বরঞ্জনের ডাক আমার কানে এল। এবার আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম। স্বরঞ্জনকে এবার দেখতে পাচ্ছি। কী সর্বনাশ! ওর রিভলবারে কি গুলি নেই নাকি! ওরকমভাবে পিছু হটছে কেন ওই পশু-মানুষটার সামনে থেকে!

পশু-মানুষটা এবার টলতে টলতে ওর দিকে এগোতে লাগল। আর ঠিক তখনই সুরঞ্জনের পিস্তল থেকে খানিকটা লাল আগুন ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল। ধূসর রঙের সেই প্রাণীটা দু-একপা এগিয়ে সুরঞ্জনকে আঁকড়ে ধরে পড়ে গেল।

আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম। মনে হল, কয়েকজন বলে উঠল: তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন।

সবাই টলতে টলতে পালাতে লাগল। আমি তাদের দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলাম কয়েকটা।

আগুনটা ততক্ষণে অনেক কমে এসেছে।

সুরঞ্জন চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে দেখলাম আর তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই আইন-পাঠক। মরে গিয়েও সে সুরঞ্জনের গলাটা আঁকড়ে ধরে আছে। পাশেই সুরঞ্জনের ভৃত্যের মৃতদেহ। আরও কয়েকটা মৃতদেহ এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। পশু-মানুষগুলো নিজেদের মধ্যেই কামড়াকামড়ি করেছে বোঝা গেল।

আইন-পাঠককে সুরঞ্জনের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে দিলাম। মনে হল ওর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। খানিকটা সমুদ্রের জলই আঁজলা করে ওর চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলাম।

একটা নেকড়ে-মানুষের দেহের নিম্নাংশ ঝলসে যাওয়া সত্ত্বেও দেখলাম সে বেঁচে আছে। সে দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে আমি এক গুলিতে তার সব যন্ত্রণার অবসান করে দিলাম।

তারপর সুরঞ্জনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। ডাক্তারী জ্ঞান না থাকার জন্যে নিজেকেই গালাগালি করতে ইচ্ছে করছিল।

ওপাশে আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে, শুধু দু-এক জায়গায় একটা দুটো কাঠ জলছে। কিন্তু এত কাঠ এখানে এল কোথা থেকে?

রোদ উঠেছে, কাঁচা সোনার মত রঙ। এতক্ষণে খেয়াল হল, আমার নৌকোটা নেই। আশ্চর্য, কোথায় গেল নৌকোটা?

তারপরেই অবশ্য সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার নৌকোটাকেই ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার একমাত্র সম্বল এবং ভরসাকে সুরঞ্জন ধ্বংস করে দিয়েছে।

ইচ্ছে হল ওর মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। আর ঠিক তখনই ও টেনে টেনে বলে উঠল: সমীরণ বাবু—

আমি ওর কপালে হাত রাখলাম। ওই একটা ডাকে যেন বিশ্বের করুণতা মাখা ছিল। আমার সমস্ত রাগ যে কোথায় গেল কে জানে! ওর ঠোঁট দুটো আবার নড়ে উঠল।

: 'সমীরণ বাবু', ও ফিস ফিস করে বলতে লাগল, 'ক্ষমা করবেন।' তারপর হাত দুটো তুলে আবার বলল: 'অভিশপ্ত পৃথিবী! সব শেষ হয়ে'...

হঠাৎ ওর হাত দুটো এলিয়ে পড়ল আর কথাও শেষ হল না। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল।

ওর বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, কোন স্পন্দন নাই।

ঠিক সেই সময়ে সদ্য ঘুমভাঙা সূর্যের নরম আলোয় ওর মুখখানা অবিশ্বাস্য রকমের জীবন্ত মনে হল।

সামনের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম ঊর্মিমুখর সমুদ্র সূর্যকিরণে চঞ্চল। পেছনে রয়েছে দ্বীপ—এইরকম ঝলমলে সকালেও যাকে আবৃত করে রেখেছে বিভীষিকার একটা নিকষ কালো পর্দা।

ডঃ সান্যাল এবং সুরঞ্জনের দেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবার।

কটেজে ফেরার পথ ধরলাম। কিছুটা যেতেই তিনটে পশু-মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সব কটার চোখেই কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। ইতস্তত করতে করতে ওরা এগিয়ে এল।

একলাই ওদের সম্মুখীন হতে হল আমায়। আর শুধু একা নয়, এক হাতে, কারণ বাঁ হাত আমার অকেজো। ডান হাতে চাবুকটা ধরে আছি আর রিভলবারটা পকেটে।

এখন একমাত্র সাহসই বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমাকে। কটমট করে তাকালাম ওদের দিকে। সে দৃষ্টি ওরা সহ্য করতে পারল না। তিনজনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তখন হুকুম করলাম: 'অভিবাদন কর। শুয়ে পড়ে অভিবাদন কর।'

আদেশ মানার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আবার ধমক দিলাম। এবার একজন একটু হাঁটুটা মুড়ল। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

এক পা এগিয়ে গেলাম। প্রচণ্ড ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারপরেই চাবুকটা চালিয়ে দিলাম। তিনজনকেই শব্দ করে স্পর্শ করে গেল সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ে আমায় প্রণাম জানাতে লাগল।

ওদের নিয়ে কটেজে ফিরলাম। ডঃ সান্যালের দেহটা সমুদ্রের ধারে

আনলাম। তারপর বললাম সুরঞ্জন এবং তাঁর দেহটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে। এ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না আমার সেই সময়ে।

প্রথমটা ওরা রাজী হয়নি। হয়ত ওঁদের প্রতি ওদের ভীতি তখনও যায়নি। শেষে আমি কয়েকবার চাবুকের আওয়াজ করতে তবে ওরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুকুম তামিল করল।

অন্যান্য পশু-মানুষদের মৃতদেহও জলে ফেলিয়ে দিলাম।

কটেজে ফিরব ভাবছি, এমন সময় পেছন দিকে কিসের একটা খস্‌খস্ আওয়াজ হল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি বিরাট হায়েনা-শুয়োরটা মাত্র দশ বারো গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'চোখে প্রচণ্ড দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। তারপর চাবুকটা ফেলে দিয়ে চট্ করে পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে নিলাম।

দ্বীপে এ-ই এখন প্রধান শত্রু আমার।

: 'অভিবাদন কর! শুয়ে পড়ে অভিবাদন কর'—প্রচণ্ড ধমকে উঠলাম আমি।

: 'কে হে তুমি, যে, তোমাকে অভিবাদন করব'; দাঁত খিঁচিয়ে ও উত্তর দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার রিভলবারটা গর্জে উঠল। বিকট শব্দ করে ও এঁকে বেঁকে পালাতে লাগল। বুঝলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি।

দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই ও গুলির সীমানা ছাড়িয়ে গেল।

অন্য পশু-মানুষদের ইসারায় বিদায় দিয়ে কটেজের দিকে এগোতে লাগলাম।

কটেজে এসে দরজা বন্ধ করে ভাবতে বসলাম কি করা উচিত এবার। কয়েকজন পশু-মানুষকে অনুগত করে রাখলে অবশ্য অনেক কাজ হবে। আর যেগুলো হিংস্র সেগুলোকে নির্মমভাবে মেরে ফেলব। তারপর যতদিন না একটা জাহাজের দেখা পাই, এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।

সুরঞ্জনের কথা মনে পড়তে লাগল। ও বলেছিল: 'এরা সবাই পাল্টে যাবে। আবার পশুতে পরিণত হবে।'

ডঃ সান্যালও এই কথাই বলেছিলেন। কাজেই সাবধানে চলতে হবে আমার। হায়েনা-শুয়োরটাকে আগে খতম করা দরকার।

খানিকবাদে আমি যখন কটেজ থেকে বাইরে এলাম, কিছুদূরে দেখি একটা পশু-মানুষ বসে আছে।

আমায় দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

: 'চলে যাও'—চিৎকার করে তাকে বললাম।

: 'আপনার কাছে একটু আসতে পারি না?' ওর গলায় মিনতির সুর।

: 'না না, যাও বলছি।'

ও চলে গেল।

আসলে খাবার সংগ্রহ করার জন্যে আমি বাইরে এসেছিলাম। পশু-মানুষটা চলে যেতেই রিভলবারে গুলি ভরে ওদের কুটিরের দিকে যেতে আরম্ভ করলাম।

ওদের আস্তানার কাছে এসে দেখলাম অনেকে গোল হয়ে বসে আছে। আমাকে প্রথমে দেখতে পেল একটা নেকড়ে-স্ত্রী, তারপর একে একে সবাই।

: 'খাবার খাবার, কোথায় আছে?' ধমকে জিজ্ঞেস করলাম।

: 'কুটিরের মধ্যে' একটা ষাঁড়-শুয়োর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলল।

ওদের পেরিয়ে সেই গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম, তারপর যত পারলাম ওদের সঞ্চিত ফলমূল নিয়ে চলে এলাম।

২০শে ফেব্রুয়ারী ॥

ডঃ সান্যাল এবং স্বরঞ্জনের মৃত্যুর পর এক মাস কেটে গেছে। মানুষ-জন্তুর দ্বীপে আমিও পশু-মানুষের মতই দিন কাটাচ্ছি।

আমার হাতটা বিনা চিকিৎসাতেই সেরে গেছে।

একদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, যদি কোন জাহাজ দেখতে পাই সেই আশায়। কারণ আমার নৌকোর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটা লোহার প্লেট খালি পড়ে আছে, যেটার ওপর জাহাজের নাম লেখা ছিল আর সেটা লাইফবোটের গায়ে আটকানো ছিল। এমন সময় আমার সামনে আভূমি নত হয়ে একটা পশু-মানুষ অভিবাদন করল। মনে পড়ল, একদিন কটেজের সামনে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি ওকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, আজ জিজ্ঞেস করলাম: 'কি চাও?'

: 'আমি আপনার কাজ করতে চাই, ওরা সবাই বলে 'তিনি' নেই, 'তিনি' মৃত, কিন্তু আমি জানি আপনি আছেন।'

: 'তোমার সঙ্গে আমার আগে একবার দেখা হয়েছিল, না?'

: 'হ্যাঁ প্রভু।'

অনেকক্ষণ ধরে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম ওকে কোন্ পশু থেকে মানুষ করেছেন ডঃ সান্যাল, এইবার বুঝতে পারলাম ও আসলে 'সেন্ট বার্ণার্ড কুকুর ছিল।

চিরবিশ্বাসী কুকুরের সত্তা জেগে উঠছে ওর মধ্যে। তাই আজ ও আমার কাছে এসেছে।

: 'আর সবাই কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: 'ওরা ওইখানে, ওরা বলছে তিনি নেই, দ্বিতীয় চাবুকধারীও মৃত, আর তৃতীয় চাবুকধারী ত আমাদের মতই মানুষ। যন্ত্রণাঘর, চাবুক, কিছুই নেই, সব গেছে। অনেকে বলছে আমরা নিয়মগুলো ভালবাসি, সেগুলো মেনে চলব, কিন্তু তৃতীয় চাবুকধারীকে মানব না।' 'কিন্তু প্রভু আমি জানি সব, ওরা বোকা, আপনার অনেক ক্ষমতা।'

: 'বেশ বেশ'—ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

: 'এক্ষুনি আপনি সবাইকে মেরে ফেলবেন' ও বলল।

: 'এইভাবে ওদের পাপ বেড়ে চলুক তারপর সময় হলেই আমি শাস্তি দেব। একজন কিন্তু ভীষণ পাপ করেছে, তাকে দেখা মাত্রই শেষ করব।'

সেইদিন থেকে কুকুর-মানুষ আমার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠল।

এরপর একদিন কয়েকজন পশু-মানুষের জটলার মধ্যে, আমি আর কুকুর-মানুষ আচমকা ঢুকে পড়লাম। বাঁদর-মানুষ বলছিল: 'প্রভু ত মারা গেছেন, যন্ত্রণাঘর আর নেই।'

: 'কে বললে নেই?' এই বলে আমি চাবুকটা সজোরে বাঁদর-মানুষকে লক্ষ্য করে চালালাম। তার গায়ে ত লাগলই তাছাড়া একজন নেকড়ে-মানুষকেও আঘাত করল।

যন্ত্রণায় দুজনেই চীৎকার করে উঠল। কিন্তু নেকড়ে-মানুষ আমার দিকে তেড়ে এল। ততক্ষণে আমি পকেট থেকে পিস্তল বার করে ফেলেছি।

গুলিটা লাগল ঠিক ওর বুকের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ও লুটিয়ে পড়ল। তখন অন্যদের দিকে চেয়ে বললাম: 'দেখলে ত প্রভু আছেন কিনা, কাজেই সব আইন মেনে চল।' যে কজন সেখানে ছিল প্রত্যেকেই নত হয়ে অভিবাদন করতে আরম্ভ করল, মুখে বলতে লাগল: 'বজ্র হানে তাঁরই হাত।'

ক্রমশ এরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, ডঃ সান্যাল মারা যাননি, অন্যত্র আছেন। আর তাঁরই জায়গায় আমি অধিষ্ঠিত।

একমাত্র হায়েনা-শুয়োরকেই আমি সুবিধে করতে পারলাম না।

২০শে জুন

আমার নির্বাসনের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত। দীর্ঘ একবছর এই পশু-মানুষদের সঙ্গে কেটেছে।

যা ভাবলে নিজেই বিস্মিত হই তা হল এতদিন ধরে কি করে এদের মধ্যে প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলাম। আমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল সুরঞ্জনের চাবুক আর ডঃ সান্যালের অফুরন্ত গুলির ভাণ্ডার। কুকুর-মানুষের প্রভুভক্তিও অনেক কাজে এসেছে।

লক্ষ্য করেছি, আঘাতের গুরুত্বই এদের সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি। মাঝে মাঝে বশে রাখার জন্যে অনেককেই প্রচণ্ড আঘাত করতে হয়েছে। তাতে অবশ্য কেউ কোনদিন বিদ্রোহ করেনি।

হায়েনা-শুয়োর বরাবরই আমাকে এড়িয়ে চলেছে, আর আমিও ওর সম্বন্ধে সর্বদাই খুব সতর্ক থেকেছি। বনের মধ্যেই কোথাও আস্তানা গেড়েছে ও। দলছাড়া হয়ে সেখানেই থাকে।

অনেকবার ওকে হঠাৎ আক্রমণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধূর্ত মানুষ-জন্তুটা প্রতিবারই আগে থেকে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। বুঝতে পারতাম, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে-ও সুযোগ খুঁজত।

প্রথম মাসখানেক পশু-মানুষরা পরবর্তী অবস্থার তুলনায় অনেকটা মানুষের মত ব্যবহার করত। কুকুর-মানুষ ছাড়াও আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছোট্ট শ্লথটাও খুব অনুগত হয়ে পড়েছিল আমার। বাঁদর-মানুষ আমার কাছে কাছে থাকলেও সারাক্ষণ আবোল তাবোল বকে বড় বিরক্ত করত। একএক সময় মনে হত ওর মধ্যে শুধু মানুষের বোকামীগুলোই আছে।

গোড়ার দিকে ওরা বেশ ভদ্র ছিল। আইনগুলোও মোটামুটি মেনে চলত, কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সেই পুরানো পশুগুলো ফিরে আসতে লাগল।

দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি থেকেই ওদের মধ্যে একটা অমানুষ-সুলভ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে এল, ফলে কথাও কম বলতে আরম্ভ করল।

পরিষ্কার ভাষা এক সময় কতগুলো অর্থহীন শব্দ-সমষ্টিতে পরিণত হয়ে গেল। ক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও ওদের কষ্ট হত। তারপর একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল।

সভ্যতার সব বাঁধনই ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

কুকুর-মানুষ আস্তে আস্তে কুকুরে পরিণত হয়ে গেল। তার কথা অনেক দিনই বন্ধ হয়েছিল, অনাবৃত দেহে লোম দেখা দিল। তারপর সে চার পায়ে চলতে আরম্ভ করল।

মানুষের সমস্ত লক্ষণই ওদের ধীরে ধীরে ছেড়ে গেল। কিন্তু তাই বলে যে ওরা সম্পূর্ণভাবে আগেকার পশুতে পরিণত হল তা নয়, কারণ সেটা সম্ভব ছিল না। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই সৃষ্টি হয়েছিল একাধিক পশুর সংমিশ্রণে। যাদের একই পশু থেকে তৈরী করা হয়েছিল, তারা অবশ্য আগেকার অভ্যেসগুলোই ফিরে পেল।

এতদিন এদের সঙ্গে থাকার ফলে আমারও নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে। জামা কাপড়গুলোও ত দেখতেই পাই, শত খণ্ডে খণ্ডিত। আবৃত অংশের চেয়ে অনাবৃত দেহাংশই বেশী।

রোজই সমুদ্রের ধারে বসে থাকি যদি কোন জাহাজ যায় সেই আশায়। কয়েকবার ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলাম বহুদূরে, কিন্তু আমার কোন সংকেতই জাহাজ বুঝতে পারেনি।

একদিন ঠিক করলাম, একটা ভেলা তৈরী করে ভেসে পড়ব, যা হয় তা হবে, এভাবে আর থাকতে পারছি না।

ঠিক এমনি সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটল। একদিন বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে আছি। এমন সময় পেছনে কার একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলাম। চমকে পেছন ফিরতেই দেখি, ছোট্ট শ্লথটা আমাকে ইসারা করছে। মনে হল, ওকে অনুসরণ করতে বলছে।

রিভলবারটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে ওর পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। কিছুটা আসার পর ও আমাকে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ঝোপটার মধ্যে একটু উঁকি মারতেই যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। দেখলাম, কুকুর-মানুষ মরে পড়ে রয়েছে আর তার ওপর বসে হায়েনা-শুয়োরটা মনের আনন্দে মাংস খাচ্ছে ছিঁড়ে

ছিড়ে। আমাকে দেখে ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, দ্বিধারও কোন লক্ষণ দেখাল না। বরঞ্চ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করে উঠল। মনুষ্যত্বের কোন লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই।

রিভলবারটা হাতেই ছিল। ওর দু চোখের মাঝখানটা টিপ করে গুলি চালালাম। সেই মুহূর্তেই বোধ হয় ও লাফিয়ে ছিল, কারণ ওর দেহটা আমার ওপর সজোরে এসে পড়ল। আমি ছিটকে পড়লাম।

কিন্তু এবারে আমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইনি। ওর থেকে-থেকে কেঁপে-ওঠা দেহটাকে কোন রকমে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অনেকটা নিশ্চিন্ত এবার।

আর একদিন সমুদ্রতীরে বসে আছি, এমন সময়ে বহু দূরে একটা নৌকো দেখতে পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শুকনো পাতা, কাঠ, খড় এই সব জড় করে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাওয়া-দাওয়া ভুলে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

এক সময় সন্ধ্যে নামল। নৌকোটা তখনও অনেক দূরে, সারারাত একইভাবে পায়চারী করতে করতে কাটিয়ে দিলাম।

ভোরের দিকে দেখলাম অনেক কাছে এসে গেছে নৌকোটা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। দুজন লোক বসে রয়েছে নৌকোতে।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভেসে চলেছে নৌকোটা। যেদিকে যাওয়া উচিত, সেদিকে ত যাচ্ছে না! আশ্চর্য, কেমন পাশভাবে ভেসে আসছে ওটা!

নানাভাবে নৌকোর লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু নাঃ, ওরা দেখতে পাচ্ছে না। চিৎকার করে ডাকলাম, ওরা শুনতে পেল না। কেমন যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে নৌকোটা ভেসে চলেছে।

একটা সাদা রঙের পাখী নৌকো থেকে উড়ে গেল, কিন্তু দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করল না।

আমি চিৎকার করা বন্ধ করলাম। চুপ করে লক্ষ্য করতে লাগলাম, নৌকোটা কোথায় যায়। একবার ইচ্ছে হল সাঁতরে নৌকোটায় উঠে পড়ি, কিন্তু তক্ষুনি একটা অজানা আশংকার পূর্বাভাস আমাকে নিবৃত্ত করল।

বিকেলে নৌকোটা প্রায় শ' তিনেক গজ দূরে তীরে ভিড়ল। কোন জাহাজের লাইফ বোট মনে হল।

আমি এগিয়ে গেলাম।

দু' একটা জন্তু ততক্ষণে ব্যাপারটা দেখার জন্যে হাজির হয়ে গেছে।

নৌকোর মধ্যে জীবন্ত প্রাণী কেউ ছিল না, দুজন মানুষই মৃত। যেভাবে বসেছিল সেইভাবেই মারা গেছে।

আমি নৌকোর কাছে দাঁড়াতেই কয়েকটা জানোয়ার আমার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। তার মধ্যে দুটো নেকড়ে-মানুষ ছিল। আর বাকিগুলো ভাল্লুক আর ষাঁড়ের সংমিশ্রণ। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম, একটা নেকড়ে লুটিয়ে পড়ল, বাকিরা পালিয়ে গেল।

কোন রকমে নৌকোটা কাত করে মৃতদেহ দুটো ফেলে দিলাম।

এর পর নৌকোটাকে টেনে হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে রাখলাম যাতে জোয়ারের জলে ভেসে না যায়। দ্বীপ ত্যাগ করতে হলে এটাই এখন একমাত্র ভরসা।

পরের দিন অর্থাৎ গতকাল সকালে ঠিক করলাম, যে কটা হিংস্র পশু-মানুষকে পারি মেরে যাব।

যেই ভাবা সেই কাজ। রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যে কটা নেকড়ে ছিল, শেষ হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বাকিগুলোকেও যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে কটেজে ফিরলাম।

ঠিক করলাম, সঙ্গে তিনটে জিনিষ নেব, খাবার, জল আর ডায়েরী—যা আমার সঙ্গে সারাক্ষণ থেকেছে।

আমার লাইফবোটের এস. এস. ভাগীরথী লেখা নেমপ্লেটটা এই নৌকোটায় লাগিয়ে নিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা আমি ভেসে পড়লাম। বিদায় মানুষ-জন্তুর দ্বীপ!

পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইছিল। রহস্যের অন্ধকারে ঘেরা দ্বীপটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। চারিদিকে অসংখ্য সর্পিল ফণা তুলে সমুদ্র আমায় ভয় দেখাতে লাগল। পশ্চিম আকাশে অস্তাচলের সূর্য তখন তার শেষ রক্তিমতা রেখে গিয়েছিল।

তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি নামল। আকাশে ফুটল নক্ষত্রের রাশি। সমস্ত দিনের পর নীল আকাশকে নিভৃতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল অশান্ত সমুদ্র। তারই মাঝে আমি ভাসলাম নতুন এক নিরুদ্দেশের পথে। সাক্ষী রইল শুধু দূর সপ্তর্ষির অতন্দ্র জাগরণ।

ডায়েরীর লেখা এখানেই শেষ।*

*এচ. জি. ওয়েল্‌সের 'আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো' অবলম্বনে।

: আরও কয়েকটি অভিনব অ্যালফা বিটা সায়েন্স-ফিকশ্যন :

মিলক গ্রহে মানুষ ॥ অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞান যাদের হাতে, তাদের শিউরে-ওঠা ষড়যন্ত্র! সাপ্তাহিক 'দেশ' লিখেছে, 'রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, ভয়াবহ!!" চাররঙা প্লাস্টিক ভার্ণিশ জ্যাকেটে মোড়া এন্টিকে ছাপা সচিত্র এই উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা চলছে॥ দাম তিন টাকা॥

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ ॥ মনোরঞ্জন দে

গিরাড শহর ছারখার হয়ে গেল মঙ্গলগ্রহের তেপায়া যন্ত্রদানবদের আগুন-রশ্মিতে! ছুটে এল তারা কলকাতার দিকে। আগুন…ধ্বংস…মৃত্যু! শ্মশান হয়ে গেল মহানগরী! ভয়াল! ভয়ংকর! অ্যালফা-বিটা 'রকেট বই' সিরিজের পয়লা নম্বর পকেট বই॥ মাত্র ৮০ নয়া পয়সায় এক পকেট ভর্তি ২৫০ পৃষ্ঠায় উপন্যাস॥

পৃথিবী থেকে চাঁদে ॥ জুল ভের্ণ

গান ক্লাবের দুঃসাহসী সভ্যেরা স্থির করলেন চাঁদের ওপর গোলা ফেলা হবে! তৈরী করতে হবে নশো ফুট লম্বা কামান। তারপরেই শুরু হলো অবিশ্বাস্য চন্দ্র অভিযান! এক নিঃশ্বাস পড়ে ফেলার মত দুখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সুবিশাল ক্লাসিক সায়েন্স-ফিকশন উপন্যাস! শ্বাসরোধী অনুবাদ করেছেন অদ্রীশ বর্ধন। আলফা-বিটা 'রকেট বই' সিরিজের ২ নং বই॥ দাম মাত্র টা. ১.৭৫ ন. প.॥

পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে ॥ গৌরীশংকর দে

একি ভয়ানক পরিবর্তন! ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দক্ষিণাবাবু দেখলেন বামনের মত ছোট্ট হয়ে গিয়েছেন তিনি। আর তাঁর আট বছরের ছেলে পেয়েছে ছ'ফুট লম্বা অসুরের মত চেহারা।…এসেছে নতুন যুগ…ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে পারমাণবিক হাতিয়ারের স্তূপ…সারা পৃথিবীতে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি! অ্যালফা-বিটা 'রকেট বই' সিরিজের ৩ নং বই। ছাপা চলছে॥ দাম মাত্র টা ১.৭৫ ন. প.॥